এই সংখ্যায়

স্বকাব্যকথন : মলয় রায়চৌধুরী, বারীন ঘোষাল, স্বপন রায়, জপমালা ঘোষরায়, উমাপদ কর, নীলাব্জ চক্রবর্তী,

অনুপম মুখোপাধ্যায়, অগ্নি রায়, ঋষি সৌরক

কাব্যানালিসিস : রবীন্দ্র গুহ, রমিত দে

কাব্যসাহিব : তৈমুর খান, সাঁঝবাতি

Look for self-descriptive

or for frame-breaking moments,

when the poem stops to tell you what it describes.

wherever the dead god stops to rest; we have স্বকাব্যকথন **invented him already, morons and skin and sex**

মলয় রায়চৌধুরী

রিভেঞ্জ পোয়েম

যে কবিতা নিয়ে এখানে কথা বলছি, তার শিরোনাম, 'কমেডি হল ট্র্যাজেডির পরগাছা', সেই কবিতাটা এরকম, এক-সিটিঙে বসে লেখা, বিশেষ ভাবনা চিন্তা করতে হয়নি, শিরোনামটা ছাড়া :

"কী নাম ছিল যেন সেই সম্পাদকের ? 'জনতা' পত্রিকার ? ১৯৬১ সালে
লিখেছিলেন, 'টিকবে না, টিকবে না', প্রথম পাতায় !
উনি ? হ্যাঁ, বোধহয় মোগাম্বো ওনার নাম ।
তারপরে ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৬৬
কে যেন সেই বেঁটেখাটো লোকটা লিখেছিল দৈনিকে

‘ওঃ, ও আর কতোদিন, টিকবে না, টিকবে না’, সাহিত্য বিভাগে ;
কি যেন কি ছিল নাম, আরে সেই যে, স্প্ল্যানেডে, বুকস্টলে
মনে পড়ছে না ? কোথায় গেলেন উনি ? সেই যে !
গাবদাগতর এক লিটল ম্যাগাজিনে লিখলেন- -
উনি ? হ্যাঁ, বোধহয় ডক্টর ডাঙ ওনার নাম ।
তারপরে ১৯৬৭, ১৯৬৮, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭২
মনে আসছে না ? চোখে চশমা ? হন হন পাশ কাটিয়ে- -
উনি ? হ্যাঁ, বোধহয় গব্বর সিং ওনার নাম ।
কেন যে পারো না রাখতে ওনাদের পিতৃদত্ত নাম ;
পঞ্চাশ বছরেই ভুলে গেলে ? গেলেন কোথায় ওঁরা !
আরে সেই যে সেই ঢোলা- প্যাণ্ট চাককাটা বুশশার্ট ?
লিখলেন অতো করে, ‘টিকবে না, টিকবে না ।’
তারপরে ১৯৭৩, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৭৯
১৯৮০, ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৮৩, ১৯৮৪, ১৯৮৫
১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৮৯, ১৯৯০, ১৯৯১, ১৯৯২
১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৬, ১৯৯৭, ১৯৯৮, ১৯৯৯
২০০০, ২০০১, ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭
২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫
কী ? মনে পড়ছে না এখনও ? অদ্ভুত লোক তো তুমি !
অতোগুলো লেখক সম্পাদক কবি পই পই করে
লিখে গেল, ‘টিকবে না, টিকবে না, বেশিদিন টিকবে না
শিগগিরই ভুলে যাবে লোকে ।’ অথচ তাদেরই নাম
মনে আনতে এতো হিমসিম ? তবে তাই হোক ।
মোগাম্বো, ডক্টর ডাঙ ও গব্বর সিংহ নামে
বাঙালির ইতিহাসে ওনাদের তুলে রেখে দিই ।”

আমার মেয়ে, যে ইংরেজিতে লেখে, 'ইঙ্ক প্যান্ট্রি' নামের ওয়েব ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত, তার জন্য আমার একটা সাক্ষাৎকার নিতে চাইছিল। কথা প্রসঙ্গে ও জানতে চেয়েছিল যে আমি কখনও 'রিভেঞ্জ পোয়েম' লিখেছি কি না । জীবনানন্দ দাশ- এর 'সমারূঢ়' কবিতাটা ছাড়া আর কোনো 'রিভেঞ্জ পোয়েম' বাংলায় লেখা হয়েছে কিনা আমার জানা ছিল না ; অমর্ত্য মুখোপাধ্যায় জানালেন যে কালিদাস রায়, যিনি শিক্ষা দপতরে ছিলেন, তিনি স্কুলের সিলেবাসে নিজের কবিতা ঢুকিয়ে দিতেন । কালিদাস রায়কে আমরা ভুলে গেছি । তার এই ধরনের কুকিত্তিকে ফাঁস করে অজিত দত্ত একটি রিভেঞ্জ পোয়েম লিখেছিলেন । কবি নির্মলেন্দু গুণ এই উক্তিটির জন্য খ্যাত, ''কবিতা আমার নেশা, পেশা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের হিরন্ময় হাতিয়ার'', তবে তাঁর প্রতিশোধ ব্যাপারটা আমি যাকে রিভেঞ্জ বলছি তা নয় ।

মেয়ের কাছ থেকে জানলুম যে প্রথম শতকের রোমে কাতুল্লুস রিভেঞ্জ পোয়েম লিখতেন, উইলিয়াম ব্লেকের 'এ পয়জন ট্রি' কবিতাও অনেকাংশে রিভেঞ্জ পোয়েম । ও আমাকে জানাল ইংরেজিতে আজকাল কী ধরণের রিভেঞ্জ পোয়েম লেখা হচ্ছে । আমার তো কারোর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার নেই, বললুম । মেয়ে জানতে চাইল হাংরি আন্দোলনের সময়ে পত্রপত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে যারা লেখালিখি করছিল, তাদের নাম, কেমন দেখতে, এসব মনে আছে কি ? ভাবতে গিয়ে দেখলুম, কারোর চেহারাই মনে নেই, আবছাভাবে কারোর কারোর আদল আর পোশাক মনে আছে। নামও জানি না তাঁদের, খোঁচাগুলো যাঁরা লিখতেন তাঁরা নামস্বাক্ষর করতেন না ; তাঁদের দিয়ে যাঁরা লেখাতেন তাঁরা থাকতেন আড়ালে লুকিয়ে। সে সময়ে যে সমস্ত সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের দপতরে হানা দিয়েছিলুম, তাদের সাংবাদিক, সম্পাদকদের চেহারাও ভুলে গেছি। সুবিমল বসাকের চিলেকোঠার ঘরে অবশ্য হলুদ হয়ে যাওয়া 'হলুদ-পত্রিকাগুলো' একবার দেখেছিলুম স্তুপাকার রাখা।

আমার মেয়ে সাজেশান দিল যে হিন্দি ফিল্মে যেমন খলনায়কদের উদ্ভট সমস্ত নাম হয়, সেগুলো ব্যবহার করে একটা 'রিভেঞ্জ পোয়েম' লিখতে পারো। উদ্ভট নাম বলতে কয়েকটা নাম মনে এলো, আর মনে হল সেই লোকগুলোর ক্ষেত্রে নামগুলো যুৎসই, কেননা এরকম নাম বললে, যাঁরা ফিল্মগুলোর সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের সামনে সুস্পষ্ট ছবি গড়ে ওঠে না । আমার সামনেও সুস্পষ্ট ছবি নেই, সেই সমস্ত সাংবাদিক আর লেখকরা উধাও হয়ে গেছেন কালিদাস রায়ের মতন, তাঁদের পত্রিকার সঙ্গে তাঁরাও মাত্র পঞ্চাশ বছরেই হাপিশ হয়ে গেলেন।

ব্যাপারটা উদ্ভট লাগলো । যাঁরা লিখছিলেন ''এরা ইতিহাসে হারিয়ে যাবে, বাংলা সাহিত্যে টিকবে না'', তাঁরা নিজেরাই কোথায় লোপাট হয়ে গেলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে তো আর রিভেঞ্জ নেয়া যায় না, নে- ই যখন তখন আর কি রিভেঞ্জ নেয়া ! তাঁদের সম্পর্কে ঠাট্টা করে লেখা যায় একটা কবিতা, মনে হোলো । মেয়ের সঙ্গে আলোচনা করে একটা ব্যাপার সম্পর্কে নিশ্চিত হলুম যে পরবর্তী

প্রজন্ম যে ধরণের কাজ করতে চাইছে তা আমার মতো নয় বলে তাদের সম্পর্কে আবোল তাবোল লেখাটা ইডিয়টিক। সময়কে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে তাদের কাজকে বিশ্লেষণ করা দরকার। তারা অমনভাবে লিখছে কেননা সমাজবিশেষ সেভাবেই তাদের পরিচালিত করছে ; কৌমনিরপেক্ষ, পরিসরনিরপেক্ষ আর সময়নিরপেক্ষ ডিসকোর্স হয় না ।

সময় থেকে সেই সমস্ত মানুষগুলোর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াটা কেবল তাঁদের ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, তাঁদের ডিসকোর্স ও ডিসকার্সিভ প্র্যাকটিসেরও ট্র্যাজেডি । ট্র্যাজেডিটি থেকে প্রত্যেকে তাঁরা নিজেদের গড়া কমিক অস্তিত্বের শিকার হয়েছেন । সে সময়েই জানতুম যে ওনারা আসলে পরগাছা, মূল গাছের টাকায় সংসার চালান ।

সফট রিভেঞ্জ নিতে হলে চোটটা পোক করে- করে দিতে হয় ; আমি তাই ডিজিট ব্যবহার করে বছরগুলো বারবার প্রয়োগ করেছি । ডিজিট, আমরা জানি, আঙুলকে বলে, হাতের আঙুল আর পায়ের বুড়ো আঙুল কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল পেনিট্রেশান করা হয় ; এভাবে তাঁদের বায়বীয় অস্তিত্বের পশ্চাদ্দেশে ‘উংলি’ করলুম । আমার কন্ঠস্বরের দ্বৈততা ছাড়াও রয়েছে হারিয়ে যাওয়া একাধিক মানুষের কন্ঠস্বর । জীবনানন্দ ‘সমারূঢ়’ কবিতায় যাঁদের বিরুদ্ধে বদলা নিয়েছেন তাঁদের লিখিত সমালোচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তিনি, তাদের তিনি জানতেন। অজিত দত্ত জানতেন কালিদাস রায়কে । কাতুল্লুস জানতেন তাঁর সাবজেক্টদের। আমি লোপাট লোকগুলো যে কারা তা জানবার সুযোগ পাইনি । তাই মোগাম্বো খুশ হুয়া, গব্বরের কিতনে আদমি থে আর ডক্টর ডাঙের হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ ।

এটাও কিন্তু বেশ মজার ব্যাপার । একদা যাঁরা ছিলেন মূর্ত তাঁরা কালক্রমে হয়ে গেলেন বিমূর্ত । রিভেঞ্জ পোয়েট্রিও বিমূর্ত ; বিমূর্ত অস্ত্র দিয়ে যাঁদের কাঁধে কোপ মারছি তাঁরাও বিমূর্ত । এর দরুণ বর্তমানে যাঁরা মূর্ত, আর উষ্মা লুকিয়ে গরম শ্বাসে ভুগছেন, তাঁদেরও বিপদে ফেলছে কমিক সিচুয়েশানটা, তাঁরা টের পাচ্ছেন যে তাঁরাও ট্র্যাজেডির পরগাছা- বিশেষ ।

বারীন ঘোষাল
রবিন বাবুর ঘড়ি

২০০৪- এর জুলাই মাসের শেষের দিকে দিল্লী গেছি। প্রতিবছরই দু একবার যাই। আমার ছেলে তখন কলেজে পড়ে দিল্লীতে। মূলত তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। হঠাৎ টেলফোন রবিনদার। রবিনদার, বলতে গেলে, চ্যালা আমি। কৌরব যখন শুরু করি, পত্রিকা, ১৯৭১ সাল, আমি আর অরুণ আইন জামশেদপুর থেকে চলে গেলাম দুর্গাপুর। তখন গল্প লিখি। রবীন্দ্র গুহ আমার প্রিয় গল্পকার তখন থেকেই। নিমসাহিত্য আন্দোলন আর পত্রিকা বেরোচ্ছে দুর্গাপুর থেকে। রবিনদা মধ্যমণি। গিয়ে তার বাড়ি। সেই সূত্রে নিমসাহিত্যের সবার সাথে পরিচয়। সেই থেকে তার ছায়া ছাড়িনি। সেদিন, ২০০৪ জুলাইয়ে ওনার ফোন পেয়ে এসব ভাবছিলাম। আসতে চান জরুরি দেখা করতে চান। হুকুম নয়, অনুরোধের সুর। থাকেন গুরগাঁও- এ। সেখান থেকে গাড়িতে চিত্তরঞ্জন পার্কে আসতেও লাগে ঘন্টাখানেক। তিনি নিজে চালান না। ড্রাইভার আছে। আমি সাত পাঁচ ভাবছি কিসের এত আর্জেন্সি ! একসময় এসে পড়লেন।

রবিনদাকে ম্রিয়মান লাগলো। গলার স্বরে উদ্বেগ, খাটো। কিছু একটা ঘটেছে। বলি,

- - - কী হয়েছে রবিনদা ? কেমন আছো ? গড়বড় লাগছে।

উনি সোজা বললেন - - - তোমার ব্লাড গ্রুপ কী, বারীন ?

আমি অবাক। এটা আশা করিনি। আমি বললাম আমার A (+) ।

রবিনদা হাঁপ ছাড়লেন। - - - বাঁচা গেল। তোমার রক্ত দেবে আমাকে ?

- - - যত চাই দেবো। কী হয়েছে বলুন ?

- - - আমার বাইপাস হবে। ফ্রেশ ব্লাড চাই। কেউ কেউ রাজি হয়েছে। তুমিও এসো। ২০ তারিখ সকাল ন'টার আগে, গঙ্গারাম হাসপাতালে।

আমি বলি - - - নো প্রবলেম। রক্ত দেবার অভ্যাস আছে। ৫০ বারের বেশি দিয়েছি। মেডেল আছে। আমি আর কমল প্রতি মাসে শুক্রবার রক্ত দিয়ে চলে যেতাম কলকাতা। তিনদিন বেড়িয়ে ফিরে আসতাম সোমবার সকালে। ঠিক পৌঁছে যাবো সকাল নটায়। মনে সাহস রাখো। সব ঠিক হয়ে যাবে।

তবে রবিনদাকে মনে হল ভীত। এটাই বোধহয় স্বাভাবিক। যার বাইপাস হবে তার মানসিক অবস্থা আন্দাজ করা যায় না। ভেবেও লাভ নেই। কিছুক্ষণ গল্প করলাম। সব পজিটিভ কথা। মন হাল্কা করার জন্য। রবিনদা তখন ৭০+। এই বয়সে তার প্রেসারের সমস্যার কথা জানতামই না। বেকার আমরা একসাথে ঘুরে বেড়িয়েছি, মাল খেয়েছি, মস্তি করেছি। এই তো সেদিন হরিয়ানার বদখল

লেকের ধারে রাত কাটিয়ে পান, ভোজন, কবিতার আড্ডা দিয়েছি। আমি, দীপঙ্কর দত্ত, দিলীপ ফৌজদার, আর রবিনদা। যাই হোক, রবিনদাকে গেট থেকে সি- অফ করে ফিরে এলাম।

বাইপাসের দিন দীপঙ্কর আগেই এসেছিল আমার ডেরায়। কিছু পরে রবিনদার ছেলে রাজন, যে সতত গাড়ি চালায় না, নিজে ড্রাইভ করে এল আমাদের নিয়ে যেতে। সে, রাজন, রবিনদার ছেলে, গুলিয়ে ফেললো গঙ্গারামের পথ। চারপাশে গোলকধাঁধার মতো খুঁজে বেড়ালো। রবিনদার ছেলে বাবার কাছে পৌঁছতে পারছে না। আমাদের টেনশন হচ্ছে। খানিক দেরিতে গঙ্গারামে পৌঁছে দেখি দিলীপও আগে থেকেই উপস্থিত। রক্ত দেবার জন্য আমিই প্রথমে তাড়াহুড়ো করে নামলাম। আমাকে চেক করা হল, রক্ত, প্রেসার ইত্যাদি। বয়স জানতে চাইলে বললাম ৫৪ বছর। জানতাম ৫৫ বছরের ওপরে রক্ত নেয় না। আমার তখন সার্টিফিকেট অনুযায়ী ৬০ বছর। মিথ্যা বললাম। রক্ত ম্যাচ করে গেল। গিয়ে সবচেয়ে আগে শুয়ে পড়লাম। রক্ত দেয়া হলে সেটা নিয়ে ছুটে গেল পিয়ন। উঠে কফি খেলাম। দীপঙ্করের রক্ত নিলো না। ওর সুগার আছে। আমার রক্ত ওটিতে পৌঁছে গেল। রবিনদার বাইপাস শুরু হয়ে গেল আমার রক্ত দিয়ে। রক্ত তো দিলাম। আমার রক্ত রবিনদার, আমার গুরুজির শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। কত বারই তো রক্ত দিয়েছি আগে। কিন্তু কারো শরীরে ঢুকছে তা এভাবে জানা হয়নি। জীবনের জন্য আমার এই সামান্য অবদান আমাকে ভাবুক করে তুলল। মন আনচান করে উঠল। দীপঙ্কর বসেই ছিল। ওকে বললাম - - - দীপু, এখন বাড়ি যেতে ইচ্ছা করছে না। কোথাও ধারেকাছে বেড়িয়ে আসি চল। আজ গিয়ে কাল ফেরা যাবে। বাড়িতে ফোন করে দিচ্ছি। আমরা একবস্ত্রে চলে যাই চল। যাবি ? দীপু সঙ্গে সঙ্গে রাজি। একা থাকে। এসব ব্যাপারে ও সবার আগে থাকে। আমি গিয়ে ওটির কাচের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলাম আমার রক্ত যাচ্ছে পাইপ বেয়ে। সেই ফিলিংটা অদ্ভুত। মনিটারে কম্পন। প্রতি সেকেন্ডে একটু একটু রক্ত। রবিনদা কি টের পাচ্ছে ? চোখ বোজা।

আমরা I.S.B.T. তে পৌঁছে প্রথমে কিছু খেয়ে বাসের লাইনে দাঁড়ালাম। দীপু জিজ্ঞাসা করল - - - কোথায় যাচ্ছি জানতে চাইলে না ? আমি বললাম - - - কিছু যায় আসে না। দূরে কোথাও একলা বসে ভাবতে চাই। আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে, ভাবনা, অনুভব স্পর্শ করছে, হয়তো কবিতা তৈরি হচ্ছে ভেতরে ভেতরে। এত মথিত হইনি বহুকাল। বাস প্রায় ১৫০ কিমি দূরে, চারঘন্টা পরে, প্রায় ২টোর সময়ে একটা নদীর ব্রিজের কাছে দাঁড়ালে দীপু বলল - - - নাও, নামো, ব্রজঘাট এসে গেছে। ওর সাথে আমিও নেমে এলাম। দেখি একটা বেশ বড় নদী। এটা নাকি গড়গঙ্গা। মূল গঙ্গার একটা শাখা। আমরা নিচে নেমে এলাম। একটা ছোট জনবসতি। খুঁজে পেতে দীপুই একটা ধর্মশালায় ঘর ভাড়া নিয়ে ঢুকলো। কবিতার চাপে আমার সমস্ত বাহ্যিক অনুভব ব্লান্ট হয়ে গেছে। আমি কেবল রবিনদার কথা ভেবে যাচ্ছি। ওটিতে শোয়া রবিনদার মনিটারের কথা।

এবার আমরা লাঞ্চ খেয়ে নিলাম। কি খেয়েছিলাম, মনে নেই। তারপর ঘরে না ফিরে নদীর দিকে গেলাম। বড় রাস্তার থেকে অনেকটা

নিচে, দুপাড় বাঁধানো, কয়েকটা নৌকা বাঁধা, একটা মন্দির, বেনারসের একটা ছোট রেপ্লিকা পাড়ের সাজসজ্জায়। আমি আর দীপু নৌকাতে উঠে গেলাম। আমি সাইডে বসা, ও দাঁড়ানো। একটু দুলছে। সেই অবস্থাতেই সে তুলসিদাসী সংকটমোচন মন্ত্র সুর করে উচ্চারণ করতে থাকল। আমরা রবিনদার কথা একবারও আলোচনা করিনি, অথচ দুজনেরই ফোকাস একদিকে। দীপু বিকেল পর্যন্ত ননস্টপ সংকট মোচনে। কী ভাল লাগছিল সেই ডিভোশন, স্বরের আবেদন, প্রার্থনার বাণী . . . . . .

বাল সময় রবি ভক্শী লিও, তব্ তিনহুঁ লোক ভয়ো আঁধিয়ারো।
তাহি সো ত্রাস ভয়ো জগ কো, য়হ সংকট কাহু সো জাত্ না টারো।।
দেবন আনি করি ভিনতি তব্, ছাড়ি দিও রবি কষ্ট নিবারো।
কো নহি জানত হ্যায় জগ মে কপি, সংকটমোচন নাম তিহারো।। . . . . . .

শুনছি আর গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। মনে দেখতে পাচ্ছি রবিনদা নড়াচড়া করছেন, মনিটারে ঢেউ। কিছুক্ষণ শ্লোক গানের পরে আমি, বিকেল প্রায় দেখে, উঠে পাড়ে গিয়ে মালের সন্ধানে, একটা ভদকা হাফ, হোয়াইট মিসচিফ, নিয়ে, আর একটা বড় জলের বোতল, ফিরে এলাম নৌকায়। বললাম - - - দীপু, ভিজিয়ে নে। আরো মনযোগ হবে সংকট মোচনে। দীপু গলা ভিজিয়ে আবার শুরু করলো, ...

বালি কি ত্রাস কপিস বসে গিরি, জাত মহাপ্রভু পন্থ নিহারো।
চৌঁকি মহামুনি শ্রাপ দিও তব্, চাহিয়ে কওন বিচার বিচারো।।
ক্যাদ্বিজ রূপ লিবায় মহাপ্রভু, সো তুম দাস কে শোক নিবারো।
কো নহিঁ জানত হ্যায় জগ মে কপি, সংকটমোচন নাম তিহারো।। . . . . . .

অন্ধকারে শুধু মুখে ভদকা আর মন্ত্রোচ্চারণ, শ্লোক। একমনে। দূরে মন্দিরে সন্ধ্যা হয়েছে। ঘন্টা বাজলো। ষোল প্রদীপের আলোদান জ্বালানো হল দুটো। ভক্তরা আরতি শুরু করল। তাদের মুখেও সংকটমোচন। সন্ধ্যা কাঁপছিল যেমন বেনারসে দেখেছি। আমার যে কী ভাল লাগছিল। দীপু আমাকে সাহস আর প্রাণ দিলো। দেখলাম রবিনদা পাশ ফিরতে চাইছেন। আমার মাথায় কবিতার লাইনগুলো তৈরি হচ্ছিল তখন। রবিনদার অপারেশন শুরু হয়েছিল সকাল দশটা দশে। এখন বাজে সন্ধ্যা ৭ টা। ধীরে ধীরে ঘটনা আর ভাবনা অমূর্ত হয়ে আসে কয়েকদিনে। কবিতা শব্দময় হতে থাকে। আমি বাড়ি ফিরে কবিতাগুলো লিখে ফেললাম একনাগাড়ে, টানা . . . . . .

রবিন বাবুর ঘড়ি
১০- ১০- ৩৪

চোখ বড় হতে হতে আকাশ হল
এক বিন্দু জল এঁকেছে কেউ

চড়ক গাছ
ছাড়ানো

পড়বে
কেন

মেঘ না জেটের গুমগুম ধোঁয়া ভরা

যেতে যেতে দেখি রূপখরা
ক্ষেতে ক্ষেতে দেখি চোখের চাষ ফুটেছে
আমাদের বাস বাঁশি হলুদ পোশাকে
গ্রামের ম্যারাপ দখল করেছে শহর
ভয় যেন কী হবে

এখানে গাড়ি ফাঁড়ি শম বিশমে নামি
একটা আমাদের পাখি নীল সবুজ খুবলে নাকানি
ছড়িয়ে ভাসা পালক জড়ো করা
পলকা গড়ন গঙ্গা গড়ানো ধাতে তীব্র সিঁথির সুর
একদা হাসপাতাল
একদা মুখাগ্নি আকাশে
আজ অনুযোগের ঘূর্ণিতে আমরাই লবেজান হাতে যাই যাই

কোন লুকোচুরি না করে বসুন ধরা দিনের কথা লিখেছি
পিঁপড়েকে পিপীলিকা লোচনকে আঁখি
পদপল্লবে মাটির বয়সী শ্রুত নিশুতের নন্দনা
এই নিশুতি আমাদের একলা করে দিলো

প্যারাম্বুলেটর ঘিরে দাঁড়ালো ভুতুড়ে ছায়া

মুছে পরিষ্কার করি রোজনামচা
সিন্ধুহাওয়ার হাপর ডায়েরি দর্শকানি দ্রোণ
খেলা ফেলা গ্রহসমাজের অনাছবি
মেঘে মেঘে কালিদাস
সুদূরের কবিতা গর্জন

১০- ১০- ৩৫
বাঁজ মেঘের গুমরে আজ চঞ্চলীন
সবার চোখে আকাশি প্ল্যানচেট
বাঁচিয়ে দাও প্রভু

এই প্রভু এখন শব্দাচ্ছে গড়গঙ্গায়
বজ্রদেশে তারজালিকা পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বীর্যবিন্দু
কচি বিজুরির জলাঞ্জলিতে নানানা
কঁওড়ের পকদন্ডী মনে পড়ালো গঞ্জিকাহীন আলো
তারে মারে দন্ডীকাটা বিসর্গের বিন্দুরূপ
পরাণ পারে ইলেকট্রনের ক্ষীণ প্রতিভার খেলা
আমরা নেমে এলাম চরজমিনের আওলিয়া জলস্রোতে

সমাপ্তি যখন হীন হতে হতে কাহিনীর সংকটমোচন
স্তব পড়ছে দীপঙ্কর সাঁতারের পরের সাঁতারে
ক্ষুদ্র রুদ্র হয়ে সবই মনে হচ্ছে অকরুণ বোমার বোমারু
জলে আকাশে বড় হতে ঘুম

চারিদিকে ব্রেকের শব্দ অকেজো আঁধার
এক বিন্দু বিজলীর খসে পড়া যৌন চমৎদাগে দেখা
সন্ত রণ শিরা সুরা স্নায়ু মোটরের চাবিওলা
রবিনের চাদর চলেছে চড়বে
চেঁচিয়ে বলি – সাদা চাদর নেবে না তোমাকে তুমবিন
জলে আকাশে রঙীন পোশাকে তোমার অচঞ্চল উড়ন খটোলা
বোমা মাশুলের অশ্রু টিপ্পনী সরিয়ে রবিন
দুষ্টু কোরো না
ফিরে এসো প্লিজ

১০- ১০- ৩৬
বীভৎস গরম
তার ওপরে কারেন্টের তিরোভাব
মিট্টিনাদে স্রোজল মোয়ায় স্লিপ করেছে চোখ
ভস্মরেখা আগুনরতি দিয়াভাস আর মন্দিরের
পাগলাঘন্টার মধ্যে পৃথিবী ভাঙার তারস্বর

একটা বধির জীবন জেগে উঠল ঘুমের আকাশে
সময় বিষয়ময়ে মাথাবিদায়ে ভাঙলো সবে পৃথিবী
শহরে বোমারু দূরে ছায়াশব্দ চুপিসারে
হৃদয়ে রেখেছে হাত ছুরি কাঁচি সুঁচ সুতো এবং বর্ষাভাবে
পুড়ে যায় বাণীদের প্রতিবাণীগুলো

টেবিলে কলম করা তলোয়ার রক্তে মসী দোয়াত
ডায়াসপোড়া বহ্নিমালাই
শেষ ভোজনের চেয়ার

নিস্তব্ধ চরাচর পেরিয়ে যাচ্ছে ফাঁপা মানুষের উড়ন্ত প্রেসক্রিপশন

প্রতীকে প্রতীকে কাটাকুটি খেলার সময় আমরা সহসা হেসেছি
হেরো রবিনকে বলেছি – এসো বুড়ো মন খারাপ করে না
দুঃখটাই সুখ আর হারাটাই জেতা
সবাই তো রবিন সেজেছি
এই যে পার্কে সবার সবুজ ফল
মডার্ন টাইমসের গরু
হাওয়া নেই বহে না এমন শব্দবোনার তার খুলছে রবিন
আমাদের মধ্যে যারা রবিন নয় তারা ঘড়ি খুলে
খুঁজছে আসল রবিনকে

১০- ১০- ৩৭
মহড়া শেষের মঞ্চে এলোমেলো জিভ সবাই পড়েছে
হোরি দশমীর স্পট গোটানো হচ্ছে মাথায়
ক্যালেন্ডার খোলা দেয়ালে চোখের সিঁদ
যারা পা পড়েছে তারা আর নেই
পশুপালনের শিক্ষা পশুদের সাথে হারিয়ে গেল
বিদেহী গল্পে জাহাজ মিল বারুদ ছোটদের স্কুলবাসগুলো

ভাঙা শহরের জলাভাবে মেঘ এসেছে পুঞ্জে পুঁজ হয়ে
ইট পাথরের মাঝে ছোঁয়াচের গানে
মনে বর্ণিত এক দাউ

ধূলো হটলে ছায়াদের আত্মপ্রতিকৃতি
ভুতুড়ে ফুল গন্ধ- অণু শোঁকা চতুস্পদে

রুমুর ঝুমুর এগিয়ে এল রবিন
উঠে দাঁড়ালো শ্রাবণের শ্রীলিঙ্গ
বৃষ্টি ফোঁটায় পরম্পরানো শুরু হল তার মোনিয়াম

রবিনের হারমনিগুলোর মধ্যে আমরা
খুঁজে পেলাম শুদ্ধ রবিনকে - - - থ্রি চিয়ার্স রবিন
হলোগ্রামে সে বানালো হলোশহর
এবং না বলার মতো পাজি হাসিতে উবে
সে বললো - - - ভাসার চেয়ে ডোবা অনেক মজার
পড়তে পড়তে এই পড়াটা হল
এই তিনটে চিয়ার্স জেনো দিল্লী হাটে কেনা

কবিতাগুলো লিখে সবচেয়ে আগে আমি দীপঙ্করকেই দেখাই, পড়াই। সেই ২০০৪ সালের জুলাই মাস। স্বদেশদা লিখেছিলেন – " জুলাইয়ের ছুটি লাগে " - - - আমরা জুলাইকে ছুটি দিলাম না। রবিনদাকে ফিরিয়ে আনলাম। রক্ত দিয়ে, স্তব দিয়ে, প্রার্থনা দিয়ে, কবিতা দিয়ে।

এই সেই কবিতা।

স্বপন রায়

কবিতা'র খোঁজে

১.
পালিয়ে বেড়াচ্ছে অরুণ সেন, পুলিশ খুঁজছে, অরুণ সেন বামপন্থী আন্দোলনের আন্ডারগ্রাউণ্ড কর্মী, চটপটে, চারটে ভাষায় অনর্গল! ও.সি. উমাকান্ত মহান্তি এ কথাও বিশ্বাস করে যে দিস ফেলো ইস আ বম্ব স্পেশালিস্ট. . .লাইক মহাম্মদ আলি, হি ফ্লোটস লাইক আ বাটারফ্লাই/এন্ড স্টিংস লাইক আ বী...ইয়ে টোকাকু ধরিবা পাঁই প্রপার প্ল্যানিং দরকার (এই ছোঁড়াকে ধরার জন্য প্রপার প্ল্যানিং দরকার) . .

২.
ইস্পাত নগরীর জন্য মে মাসের সূর্য ফার্নেস নামাচ্ছে তখন, আমি স্বপন রায় তখন উনিশ, আমার মাথায় শাদা পানামা টুপি, যেমন গাভাস্কার তখন! প্যান্ট, সার্ট, চটি অবশ্য অগাভাসকারীয়! আমি ভারতবর্ষের অন্যতম ধনী শহরের নাকের ডগায় এসে দাঁড়িয়ে আছি! ঠিকা শ্রমিকদের বস্তি, আমি তাদের নূন্যতম মজুরি নিয়ে বোঝবো, সেই নিদাঘের অপরিমেয় নিস্তল রুদ্রতায় আমার জিভ শুকিয়ে আসছিল, আমি জল চাইছিলাম, পেলাম! আমি উনিশ বছরে আর আমি কবিতাও লিখি! জল যে দিল সেই মধ্য চল্লিশের মহিলা সঙ্গে বাতাসাও দিল আর বললো, এ পুও তু কাঁহিকি আসিছু এঁইঠি, যা বাপ্পা ঘরকু যা, পোলিশবালা তোতে ছাড়িব নি, কালি রাতিরে আম ঘরদুয়ার সবু ভাঙ্গি দেলা, আম উপরে লাঠি চলাইলা. . তু যা বাপ্পা, ফেরি যা ঘরকু (হ্যাঁরে বাপ, তুই এসেছিস কেন এখানে? যা বেটা ঘরে ফিরে যা, পুলিশ তোকেও ছাড়বে না, কাল রাতে আমাদের ঘরদোর সব ভেঙে দিয়ে লাঠিচার্জ করেছে..তুই ফিরে যা বাপ, নিজের ঘরে ফিরে যা!) এক মা এ সব বলছিল, আমি কবিতা লিখি তখনই, আমার উনিশ বছর বয়স, আমি কার্ল মার্ক্সের কথাও ভাবলাম, কমরেড মার্ক্স, 'থিওরি অফ সারপ্লাস ভ্যালু' আমি এই ধ্বংসস্তূপের ওপরে দাঁড়িয়ে কি ভাবে বোঝাবো?

৩.
অরুণ সেন ডাইরিতে লিখে রেখেছেঃ
১৯৭৫ ৩ মেঃ ইস্পাত কারখানার ঠিকা- শ্রমিকদের বস্তিতে গিয়েছিলাম! এঁরা যে সব কুঁড়েঘরে থাকেন তাদের উচ্চতা হল সর্বাধিক পাঁচ ফুট! আমায় অনেকটা ঝুঁকে এঁদের ঘরে ঢুকতে হল! কোন জানলা নেই, আটফুট বাই পাঁচফুট, নাকে সর্দিবসা বাচ্চারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, রোজ সাড়ে ছ'টকা মজুরি! অপুষ্টি স্বাভাবিক!! চারদিকে কাঁচা নর্দমা, কোন শৌচালয় নেই, স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে খোলা জায়গায় প্রাকৃতিক কাজ সারে,

আঠাশ বছরের স্বাধীনতা এখানে এসে শেষ.... পুলিশ আমায় খুঁজছে, দৈনিক মজুরি সাড়ে বারো টাকা আর ঠিকা- শ্রমিকদের স্থায়ী করার দাবীতে লাগাতার ধর্মঘটের দিকে ইস্পাতনগরীর ঠিকা- শ্রমিকরা, এদের সঙ্গে আমিও আছি, সেই আমি যে মোহাম্মেদ আলি'র মত, "ফ্লোটস লাইক আ বাটারফ্লাই/এন্ড স্টিংস লাইক আ বী. . . . "

৪.
আমি স্বপন রায়, তখন উনিশ বছরের কবিতায় এই বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে'র আঁচ রাখার ফাঁকেই দেখতে পাই নগরীর ইস্পাতপৌরুষে অস্তের স্পা ঝিরঝির করে নামিয়ে দিচ্ছে এক বাঁকহারা মুখের আফ্রোদিতি হাওয়া, আমি ওই শ্রেণীক্ষুদ্ধ আবহাওয়াতেই অল্প অল্প গ্রীক হতে থাকি, কবিতা থেমে যায়, হারিয়ে যায়, আমি এক চির- দুবলা এহসান- ফরামোস তাকে কিছুই দিতে পারিনা, সন্ধ্যা নামে আমায় আর অরুণ সেন'কে মিশিয়ে দিতে!

৫.
সংকরায়ন শুরু হয়, ওই যেমন এলয় স্টিল, যেমন ফার্নেসের ব্লুমিং অস্তরাগে সূর্যগুঁড়োর মিশে যাওয়া, যেমন প্রথম তারুণ্যের করুণাঘন অপারনিপার কলকলে শরীরের শ্রুতকাম শিমূলের ফেটে পড়া আর এক চরম অসহায়তায় দেখতে থাকা যে কবিতা,আমার নিজের কবিতা কেন এর, ওর, তার ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তুচ্ছ মনে হয় সব, নিজেকে আর বিশেষ করা যায় না, সোভিয়েত নেই, সাম্যবাদ পিছু হটছে গরবাচভ কথিত জাপানিজ মিরাকলের টেকনোপ্লাবী উন্নয়নে! চলে এল ইণ্টারনেট, গ্লোবালাইজেশন, ইউনিপোলার দুনিয়া হাতে পেয়েও পুঁজিবাদের মক্কা আমেরিকার অর্থনৈতিক সর্বনাশ আটকানো গেল না, চীনের দেওয়া ৮০০ বিলিয়নের সৌজন্যে তারা এখনো চলিষ্ণু! টেকনোবিপ্লবের আধার হয়ে ওঠা চীন, সারা পৃথিবী জুড়েই আবার সোশাল- ডেমোক্রাসি এবং বামপন্থার উত্থান, TINA (there is no alternative)'র মুখ থুবড়ে পড়া, হিংস্র সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদের ব্যাপ্তি....সময় সঙ্কর হয় আর আমি হাইব্রিডিটি'র অফুরন্ত পুলক ছেড়ে খুঁজতে থাকি নিজেকে আর হারাতে থাকি নিজেকেই. . . .

৬.
আমি কালাহান্ডি যাই, কবিতা পড়তে! সেই কালাহান্ডি যেখানে তার কিছুদিন আগেই এক অনাহারক্লিষ্ট মা তার সন্তান'কে বেচে দিয়েছিল! কালাহান্ডি জুড়ে তখন বসন্ত, সেই মা বা তার সন্তান'কে আমি দেখিনি, কবিতায় আনার চেষ্টা করিনি, দুঃখ পেয়েছি কিন্তু যারা দুঃখ নিয়ে হাহাকার করে, সোচ্চার হয়ে লম্বা লম্বা কবিতা লেখে আমি তাদের সাথে একাত্ম হতে পারিনা! দুঃখ এক অন্তর্দাহ, দুঃখ এক চিরকালীন সম্পর্ক, কবি তাকে রক্তে মেশায়, তার সব কবিতায় সে থাকে অপরিমিত বিষয়ভাসান হয়ে, দুঃখ এক কবিতানিরপেক্ষ সহাবস্থান, "হাত সে ছুঁকে ইসে রিস্তোঁ কা ইলজাম না দেও. . " দুঃখ'কে দুঃখিত করে লাভ কি?

৭.
অরুণ সেন'কে পুলিশ পায়নি, অরুণ স্বপনে বিলীন হলেও খুব একটা বদলে যায়নি এই সঙ্গিহীন একাকী গ্রহ, কারণ সিকিমে'র সাঙ্কোচোলিং যাওয়ার রাস্তায়, ২০১৪'র ডিসেম্বরে স্বপনের সঙ্গে দেখা হয় সেই পাথরভাঙা বৃদ্ধের সঙ্গে যে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি পাথর ভেঙে তিরিশ টাকা মজুরি পায়, স্বপন অবাক হয়ে দেখে পৃথিবী'র অচলায়তনের নির্বিকার রূপটিকে, আরো অবাক হয় সেই বৃদ্ধের নিষ্কলুষ হাসির প্রবাহে যা একদিকে যেমন শোষণবিনাশি, অন্যদিকে তেমনই জীবনসাপ্টানো ধারাপাত! স্বপন আশ্বস্ত হয়, প্রথম তারুণ্যে দেখা সেই মায়ের হতদরিদ্র মুখের উদ্বেগ মনে পড়ে তার! সেই মা আর এই বৃদ্ধ এক ভাণহীন দুনিয়ার বাসিন্দা, যেখানে স্বপন রায় নতজানু হয়, আর মনে মনে ধন্যবাদ দেয় নিজেকে যে কবিতায় সে এঁদের বিষয় করেনি বরং তার সব কবিতাই এই জীবনজোড়া দেখার এক অবিধিময়তা যেখানে এমনকি গাছের নির্জনতম পাতার ডগাতেও লেগে থাকে ওই মা বা এই শ্রমিকের শঙ্কা আর হাসির মিলনসার ছাপগুলো, স্বপন জানেনা সে যা লেখে সে সব কবিতা কিনা, তবে এও জানে সে ভণ্ডামি করেনি, কবিতাকে সময়শাসিত করেনি, কবিতাকে গান বা গল্প করেনি!

তো, এখানে এরকমই একটি লেখা দিলাম! এই লেখা কবিতা না অন্যকিছু তার বিচার মূল্যবাদীরা করবেন, তবে আমি জানি আমার লেখার কোন মূল্য যেমন নেই সেরকমই তার কোন সুযোগও নেই বিষয়আশয় হয়ে ওঠার!

সিনেমা সিনেমা- ২৬

বাড়ি এখন
বাড়ি তখনো একটাই
দুটো হলে দুরকম দুঃখও হত

একদিন সুখ বড় হবে
এই বোল
এই আশা মুন্ডাদের গ্রাম পেরিয়ে
বাড়ি টাড়ি পেরিয়ে
জলে

জলের কোন রঙ নেই
তবু জল রঙ
বাড়ির অবশ্য ধরা- চাঁদ আছে
বিছানায় কাজ
সূঁচ থেকে নেয়া ফোঁটা ফোঁটা মৃদঙ্গ
ধা- ধা বাঁয়া

বাড়ি
আলো আর টুকটুকি থাকলে তবেই

জপমালা ঘোষরায়

আমার আমিয়ানা

ধারাপাত

এক- এ- চন্দ্র, তোমার শিথিল লিঙ্গ ভিজে আছে জ্যোৎস্নায়, আমি দুই- এ- পক্ষ বিস্ফারিত মথিতযোনি এক, তিন- এ- নেত্র এখন নির্লিপ্ত ঘুমের মধ্যে, জলঢোড়ার মতো ভীষণ ঠান্ডা, চার- এ- বেদ পারস্পরিক জেনে নেওয়ার নির্বেদ অবস্থানে, পাঁচ- এ- পঞ্চবাণ মারো দেয়ালে আবার, অনেক সৃস্টি বাকি. . . . .
দেখ, বহতা নদীর ডিম্বাশয়এ অজস্র নতুন গ্রাম, পাম্পঘরের প্রবল লিঙ্গোচ্ছ্বাসে ছয়- এ- ঋতুর প্রতিটি ঋতুতে গর্ভবতী হচ্ছে একএকটি

মাঠ, শরীর তো বিন্দু মাত্র, আমি তোমাকে অনন্তে রেখে দিতে পারি, ছয় ঋতুর গভীরে, সাত- এ- সমুদ্র, আট- এ- অষ্টবসুর যৌথ হিসাবখাতায়, নয়- এ- নবগ্রহের ব্যাঙ্কে, দশ- এ- দশদিকে দশ শতকরা সুদে।

এরপর এর কথা তুমি তো সবই জানো, টাকার চেয়ে সুদের মিষ্টতার গল্পগুলো, যেমন পারফিউম এর চেয়ে ভেষজ ঘাম ও অশ্রুনির্যাস।

প্রেক্ষিত : -
কবিতাটা ২০০৫ সালে লেখা। ততক্ষণে কলকাতা বইমেলায় আমার ২য় কাব্যগ্রন্থ 'শিশিরের নেটওয়ার্ক' প্রকাশিত হয়ে গেছে। এই বই এর সূচনাকথায় আমি লিখেছিলাম ''বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতার ঘনীভবন থেকে জমে ওঠে শিশিরবিন্দু।'' এই ঘনীভবন বিষয়টা আমাকে খুব নাড়া দেয়, মনে হয় মানুষের মনোজগতেও এই রকমভাবে ভাবনার ঘনীভবন ঘটে। আমি মধুঘটিত রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রতিদিন গঙ্গা এবং অজয় নদী বরাবর হাঁটি। সঙ্গে কে কে থাকে তাও উল্লেখ আছে। এখানে তা নিষ্প্রয়োজন। একই রসের ভিয়েনে এই কবিতাটারও জন্ম তবে কোনো কারণে এই কবিতাটা উক্ত কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত করা যায় নি।

কুয়াশায় আচ্ছন্ন নদীবাঁধের খেজুর গাছগুলো থেকে রসের ঠিলি নামানো হচ্ছে। রসের ব্যাপারীরা (রসিক?) বাঁকে করে রস নিয়ে যাচ্ছে। আমার সঙ্গী বন্ধুটির রসের অভাব ছিল না। কিন্তু বোধ ও বোধির অভাব ছিল। সে রসপ্রসঙ্গকে রসিকতা করে মোটা রুচির রতিক্রিয়ার পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইলেও আমার রসায়নে সেই প্রক্রিয়ার ঊর্ধ্বপাতন ঘটল। একটা ঝকঝকে নিকানো উঠোনের গোয়ালে ২টো গরু বাঁধা। বাঁট টেনে টেনে গৃহকর্তা নিষ্কাশন করছেন ফেনিল দুধেল নির্যাস। উঠোনে মাদুর পেতে ছোট্ট ছেলেটা ধারাপাত মুখস্থ করছে। এক এ চন্দ্র.... দুই এ পক্ষ.... ইত্যাদি। চারিদিকে মৌরি আর সর্ষেখেতে প্রকৃতির যোনিগন্ধ... বেগুন কপি প্রভৃতি অঢেল শষ্যভান্ডারে মৃত্তিকার আঁতুড় ঘরের গন্ধ.... আমি এইসব গন্ধ পাই। মনে হল মৃত্তিকার প্রকান্ড জরায়ু..... নদী থেকে পাম্পের সাহায্যে যে জল তুলে সিঞ্চন করা হচ্ছে তা পুরুষের লিঙ্গোচ্ছ্বাস যা মাটিকে অনবরত গর্ভবতী করছে। এই অনন্ত সৃজনের ভাবনা কবি ও শিল্পীদের মনে ও মননে আসে। সহৃদয় হৃদয়সংবেদী পাঠকের চেতনায় ঋদ্ধি আনে। আমার ভাবনা নতুন কিছুই না। অনন্ত সৃজন মানেই পুং ও স্ত্রীর পূরকতা। পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতির রতিলীলা। এভাবেই যৌন হয় যৌনান্তিক। এভাবেই সবুজমানববাদ বা ইকোহিউম্যানিজম চলে এল কবিতাটাতে।

কবিতা যা বলছে: -

বিনিদ্র রাত্রির প্রেক্ষিতে ১- এ চন্দ্র তার চন্দ্রকলার হ্রাসমান অস্তিত্বে যখন ভোরের দিকে ঝুঁকে থাকে তখন সে শিথিললিঙ্গ পুরুষ। তার লিঙ্গ ভিজে আছে সঙ্গম পরবর্তী নির্যাসে। জ্যোৎস্নায়। আর আমি ২- এ পক্ষ বিস্ফারিত মথিত যোনি। দুই পা মুড়ে আকাশের দিকে যোনিপথ উন্মুক্ত করে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা নারীর বিভঙ্গে নিজেকে কল্পনা করা, এইভাবে নিজের সত্ত্বাকেও পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতির সৃজনলীলার সঙ্গে একাত্ম করে দেওয়ার প্রয়াস। ৩- এ নেত্র। দুই নয়নের দেখার ভিতর ও কোথাও যেন একটা তৃতীয় নয়নের বীক্ষণ থেকে যায়। ৪- বেদ। অর্থাৎ সংবিদ। যা বীক্ষা থেকে জন্ম নেয়। ৫- এ পঞ্চবাণ। পঞ্চশর এর বেদনা মাধুরীর অনুভব। ৬- এ ঋতু। ছয় ঋতুর চক্রাকার অস্তিত্বের মধ্যে থেকে স্বয়ং প্রকাশিত হয় সৃজনসক্ষম সঙ্গমপারঙ্গম ঋতুমতী নারী। ৭- সমুদ্র। সাত সমুদ্রের তোলপাড়ে এবং লবনে সিক্ত হয় সবুজমানব। ৮- এ অষ্টবসু এবং ৯- নবগ্রহ অনবরত স্থিতিস্থাপকতা দেয়। সৃজন থেকে লালন শেখায়। ১০- দিক এই সৃজন ও লালনকে ব্যাপ্তি ও গভীরতা দেয়।

আমিয়ানা : -
না। কোন অয়িদিপাউসিয় ভাবনা না। ফ্রয়েডিয় কমপ্লেক্সও না। মা ও তার পুরুষ সন্তান। তখন সে কোন পুরুষ নয়। যখন যোনি থেকে নির্গত হচ্ছে, মুখ রাখছে সেই নারীর মৌ- টসটস স্তনে। সঙ্গম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যদি সহগমন হয়, তাহলে তুমি গমনপথ হয়েই আসছো। এরকমই একটা কবিতা লিখেছিলাম 'মা' কে নিয়ে 'শিশিরের নেটওয়ার্ক' এ।

ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে অনন্ত সঙ্গম। অর্গাজম হচ্ছে। বীর্যপাত হচ্ছে। সৃজনের মগ্নতার মুহূর্তে লয় এতটাই তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে যে জীবন থেকে কোনও কিছুর চলে যাওয়া বা শেষ হয়ে যাওয়া আমাকে বেশীক্ষণ থমকে রাখছে না। আমি সহজেই যে কোনো ট্রমাকে অতিক্রম করতে পারছি। এক বন্ধু একবার আমাকে বললেন তিনি কিছুতেই একটা ছবি আঁকতে পারছেন না। ২বার মাস্টারবেট করার পর ছবি এল। অর্থাৎ আত্মরমণ হোক বা নারী পুরুষের স্বাভাবিক রতিক্রিয়া হোক রমন বিষয়টা তাঁকে সৃজনে উদ্বুদ্ধ করল।

"যে কোন সঙ্গম শুধু সঙ্গমেই শেষ হয় না। লালায়িত অন্ধকার থেকে উঠে আসে অক্ষ এবং দ্রাঘিমারেখা, আহ্নিক ও বার্ষিকগতি, ঋতু পরিবর্তন, ভূগোল এর চিরকালীন অধ্যায়।" (শিশিরের নেটওয়ার্ক)

নির্যাস বা extract শব্দটা আমার কাছে খুব জরুরী একটা বিষয়। যে সব ভেষজ আমাদের biologically সুস্থ রাখে তার fiber টা জরুরী ঠিকই, কিন্তু নির্যাসটাই কাঙ্খিত। নির্যাস শব্দটাকে যদি প্রতীকী অর্থে গ্রহণ করি তাহলে দেখব মানব নামক বস্তুর নির্যাস হল মানবত্ব, যা অধিক কাঙ্খিত। বস্তু নির্মাণ করি ভাবকে শরীর দেবার জন্য। পুরুষের বীর্য তাহলে পুরুষসত্ত্বার extract। রস থেকেই রসাতল, রস থেকেই রসায়ন। পরিমিতি ও পরিণতি আপনার হাতে। এই বোধ থেকেই আমি 'আমার দরবারী জন্ম' কবিতায় একটা concept এনেছিলাম। আমি যখন মাতৃগর্ভে তখন আমার কবি এবং এসরাজবাদক বাবা আমার মৃতবৎসা মা কে এসরাজে দরবারীকানাড়া রাগ

বাজিয়ে তৃপ্তি দিতেন বলে শুনেছি। এই সুরের উদ্দীপনবিভাবনাকে সামনে রেখে আমি খুব সহজেই পিতামাতার সঙ্গম কল্পনা করে লিখেছিলাম :

"গলিত রজনের মত ঝরে পড়া বাবার গ্রন্থিস্রোত মিশে যাচ্ছে মা এর গর্ভজলে. . . . . "

শেষ কথা: -

আমার এ হেন conceptএর কারণে রক্ষণশীল ইঁট পাটকেল বচনবাণ কম সহ্য করিনি। SMS & phoneএ কোবতে টোবতে লেখা অনেক মহাকবির চুলকানিও খেয়েছি। "আপনার কোবিতাগুলো মাইরি হেব্বি সেক্সি" এরকম চেনখোলা বাহবা এবং স্থুল রতিক্রিয়ায় সরাসরি আমন্ত্রণমূলক ইশারাও সহ্য করেছি। আমি বহুবার বোঝাতে চেয়েছি। শুন্যকাল ওয়েবজিন এর সম্পাদক ও বন্ধু দীপঙ্কর দত্ত আমাকে এই সেলফি বা আত্মকথন লেখার সুযোগ দিয়ে ধন্য করলেন। তাঁকে ধন্যবাদ।

উমাপদ কর

ঘূর্ণি- পাঠঃ নিজস্ব মৈথুন

মৈথুন

কী যেন বলতে চাওয়ার ঘূর্ণি সাবেকের পা ছুঁয়ে একলা হয়ে যেতে চেয়েছিল
তুমি তার আষ্ঠেপৃষ্ঠে সম্পর্কের পশরা সাজিয়ে দিলে
তুমি তার টুংটাং নিয়ে অনেক তলের স্থির নিরবধি লক্ষ্য করে যাচ্ছিলে
তুমি তার ঘাগড়ার নিচে বসন্ত বনের কয়েকটি ফুলের ফুটতে থাকায় অনুঘটক
ফিরতে পারছিলে না আর বিকেল বেলার ফুটনোটে
ঝঞ্ঝা নিজস্ব ভঙ্গীতে জুড়িয়ে যাচ্ছিল যৌনক্রমে. . .
শৌখিন ফুটে উঠবে দূরের বসার ঘরে, আলোর কিসমিস ঘিরে পতঙ্গ ঠোঁট
কোনো এক প্রাচীন কিস্যার গা থেকে খুলে খুলে পড়বে নিকানো ডাঙা
পথের প্রায় অন্তে এসেও বাদামি বরফ ভুলে যাবে অভিসার
তুমি তার ভূমি আমূল নাড়িয়ে বাঁকানো হাতের আঙুল নাড়াবে
প্রিয় কে প্রিয়তম করতে আর কোনও উপাদান সেভাবে ছিল না
ডুবে যাওয়ার আগে বরফে ঘূর্ণির রঙ আমরা অনেকেই দেখে যেতে থাকব. . .

রোদ উঠেছিল বেশ। শীতটাকে মাখো মাখো করে রাখছিল। আমেজ নিজেই চা বানিয়ে দিয়েছিল সাতসকালে। বাইরের কাঠখোট্টা বারান্দাটাকে কাশ্মীর বানিয়ে দিয়েছিল দুটো লেজঝোলা। তাদের কিচির মিচির মেশানো হালকা বাতাস দখিনা সমীরণ হতে চাইছিল। এই চাওয়াটাই একটা নেশার উপকরণ। আমি মোহিত হব কি হব না ভাবতে ভাবতে দরজায় বেল। নিশ্চিত আজকের খবরের কাগজ।

একদম ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেল জানালাটা। বাইরের বারান্দার গায়ে জলপ্রপাতের মত ওটা ঝুলছিল। আমি কি উঠে যাব? নাকি রোদের রিডগুলোতে নিজেকে সা- রে- গা- মা করে রাখব? নাকি কল্পিত কোনো চন্দ্রমল্লিকার টবে, কী জিনিয়ার টবে বিন্দু বিন্দু জল পড়ার ব্যবস্থা করব? আমার বাড়িতে তো কোনও ফুলগাছ নেই। বারান্দায় বসে অবশ্য একটু নিচু করে চোখ রাখলে পাশের বাড়ির ফাঁকটাতে ফুল ফুটে থাকে। বড় যত্ন করে এক বৃদ্ধ। ফুল ফোটানোর মত মুখটা তাঁর। মাঝে মাঝে বৃদ্ধাও আসেন নিড়ানি হাতে। মাটিতে টবে গাছ বাড়তে থাকে, ফুল ফুটতে থাকে।

খবরের কাগজটা জারজ শালা। মাথা আছে তো ধড় নাই। ধড় আছে তো মুন্ডুহীন। ছারপোকায় পেচ্ছাপ করে রেখেছে। মশাদের বীর্যপাতে লাস্য। ৫৭ ধর্ষণ, ১১৩ কেপমারি, ৬৪ রাহাজানি। ১২ দলবদল, ১৩ খুন, ১৪৪ সীমান্তে পাচার। ১৭ আর্থিক ঘোটালা, জড়িয়ে কয়েক লক্ষ কোটি । রাজনীতির নেংটি ইঁদুর দাঁতে কেটেছে দিস্তা কাগজ। খেলায় মাল ছড়ানো, সিনেমায় মাল ছড়ানো, মালামাল বিজ্ঞাপন। তবু রোজ আসে রোজ কুঁতকুঁতে চোখ গোল হয়ে ঘোরে। সকালবেলার শীতেরও একবার মৈথুনে প্রবৃত্তি হয়। সবকিছু দুমড়ে পিচ্ছিল দুপুরের যোনিতে গমন করতে চায়।

বলতে চাওয়াগুলি জড়িয়ে জড়িয়ে ওঠে বাস্পাকারে। গুম মেরে থাকে। হালকা মেঘ ঘণ হতে থাকে। যুদ্ধযাত্রা প্রস্তুত। ঘূর্ণি ঘুলিয়ে ওঠে। বলতে চাওয়াগুলি ঝাপটাতে থাকে। আছাড়- পিছাড় খায়। সবকিছু টালমাটাল করে ভেঙেচুড়ে সর্বনাশের গোড়ালি নড়িয়ে মাথাকে বনবন করে ঘোরাতে থাকে। আমি কি পড়ে যাব? এই বিপাকে কাত হয়ে পড়ব কলাগাছের মত? নাকি এক দমকা বাতাসে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলবে কোনো অস্তিত্বহীনতায়? আমি কী? আমি কেন? এসব এখন আর খুব জরুরী মনে হচ্ছে না। শুধু জানার ইচ্ছে আমি ঠিক কোথায়? একটা সামান্য স্থান, একটা কয়েক ফুট, একটু পায়ের নিচে মাটি হোক পাথর হোক বালি হোক কিছু হোক, আছে তো? সংশয়, আছে তো? একা হয়ে যাই বুঝি। একা, একা। এই ঘূর্ণিটাই আমাকে একা বানিয়ে ছাড়ল। আমার ভূগোলে নিয়ে এল এক বিরাট পরিবর্তন। এক সময় আমি আর ঘূর্ণি সমার্থক হয়ে উঠলাম। সেও কেমন একা হয়ে গেল। শীতের রোদ আমেজ ভেতরে ঢুকে ঘূর্ণি আর তাতেই একা।

সিগারেট আমায় মাঝে মাঝে উদ্ধার করে। খাদের কাছ থেকে বাঁচিয়ে দেয়। এখন তার স্মরণ নেওয়া যেতে পারে। শীত- রোদের আমেজের পরও আমার আরেক ধরনের একটা আমেজ চাই। এর পরপরই আসবে রান্নার মাসি। আসবে কাজ করার মেয়ে। আমাকে তাদের সঙ্গেই কাটাতে হবে দু- দন্ড। নিত্যকার জাবর কাটার মরশুম। এই গতানুগতিকতার মধ্যে কি কোনও প্রেম আছে? আছে কি যৌনতা? শুধু অভ্যাসের খড়কুটো জাপটে ধরে ভেসে ভেসে চলা। চাল নেই? আনতে হবে। লবণও কি বাড়ন্ত? সব্জীতে বেশি নুন দিও না। প্রেসার বেড়ে যাবে। নুর, ঘরের কোণাগুলোতে কী ধুলো কী ধুলো! পরিস্কার করে নিও। আর ঝুল বাড়িময়। ওরা শুধুই আমার নিশ্বাসে ঢুকে

পড়ে। ঝুলঝাড়াটা কি ফতুর হয়েছে? তার চেয়ে এইতো এই রোদের আমেজে, এই ঘণ মেঘ ঘূর্ণির মধ্যে বেশ আছি। থাকুক না সেখানে বলতে চাওয়ার আকূতি। নাহয় বলতেই পারলাম না। আছাড়ি- পিছাড়ি খেলাম। উড়তে লাগলাম, কল্প যৌনতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকলাম, পাশের বাড়ির ফুল দেখতে দেখতে মাম হয়ে গেলাম।

এসব ঠারে- ঠোরে কথা বলার জন্য কবিতা লেখা হয় নাকি? যাচ্চলে। আমি তো ভাবছিলাম তোমার কথা। তুমি এবং মৈথুন। মৈথুন আর তুমি। তুমি সর্বনাম। মৈথুন ক্রিয়া। তো তোমার চারপাশটা খুব সাজানো গোছানো। তুমি নিজেও সাজানো। তুমি মানে একটা সম্পর্ক। গুছিয়ে তোলা একটা জীবনের সুখি সুখি ভাব। আমি সর্বনামের ওপর ক্রিয়া বসাতে কোনও উদ্যোগ নিই না। কেন? কেন? আবার ঝাপট। সুখি ভাবটা ছিঁড়ে খুঁড়ে যাবে এই ভয়ে। নাকি আরও সুখ আমার সইবে না? এ আমি কোথায়? কিসের জন্য সেই থেকে বসে আছি? কোথা থেকে কোথায়ই বা যাওয়া যেতে পারে? দহন শুরু হবে কি এখান থেকেই। হোক তবে। পুড়তে পুড়তে ছিলা টান রেখে যাব।

আমার একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে আমি মনে করি। আর তাতেই স্মৃতি দুলে দুলে আসে। স্মৃতিই কি ইতিহাস? এমত প্রশ্নে আমি তোমার দিকেই ফিরে তাকাতে পারি। তুমি আর আমি কি আলাদা অস্তিত্ব? আবারও প্রশ্ন? এত প্রশ্ন কেন? আমি সাকার, তুমি নিরাকার। তোমাকে আমিই বানাই শত ফুলে সহস্র ভঙ্গীমায়। তোমাকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করতে করতে পথ হাঁটি, দৌড়াই। নিজের রসস্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলি অন্য কোথাও। নিজের আনন্দে তোমাকে পাগল করি। তুমি অনায়াসে হাত মেলে দাও। টোয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও নতুন বিভঙ্গে। তোমার চুল উড়তে থাকে। ঠোঁটদুটো সামান্য ফাঁকা। চোখ মৃদু খোলা। তোমার স্তনভারে তুমি সামান্য ঝুঁকে। নাভীতে মন্ডলাকার তারা ফুটে আছে। তুমি সমর্পনের সমস্ত উপকরণ সাজিয়ে নির্নিমেষ আমার দিকে। আমি যৌনতায় মুগ্ধ হয়ে পড়ি, হয়ে পড়ি মূঢ়। যেন তোমাতে গমন এক অবধারিত প্রক্রিয়া। আমি তোমাতেই লীন হই, তুমি আমাতে। আমাদের আলাদা অস্তিত্ব কষ্টকল্পনা।

পুরোনো গল্প ঘুমোতে জানে না। সে তার শরীর থেকে গয়না খোলার মতই নিত্য নতুন ডাঙা দেখায়। সেই ডাঙার ভূগোলে এমনই মহিমা যে আমাদের শরীরে রোমাঞ্চ জাগে। আমাদের ভ্রমণ তার প্রতিটি কোণায়, প্রতিটি চিহ্নে। বর্ণনাতীত এক ভ্রমণে আমরা পাল্টে পাল্টে যাই। নিজেকেই অচেনা মনে হয়। তখনও তুমি আমার মধ্যেই আসীন। আমি তোমাকে ঘর দেখাই দরজা দেখাই ঘুলঘুলি দেখাই। আমি তোমাকে আড়াল দেখাই অজানা শোনাই জানা গানের দু- চার কলিতে তুমি ঘুমিয়ে পড়। আর আমি তোমার মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে কখন নিজের চুলেই বিলি কেটে যাই। এই ডাঙা ডাঙা খেলা চলতেই থাকে। আমি তার মোহে তার মস্তিতে বিহ্বল হতে থাকি। আমার জানালা খুলতে থাকে, আমার ঘুলঘুলিগুলো আকাশ হয়ে যায়। এই বিশাল আকাশের নিচে আমি তোমাকে নিয়ে একজন হয়ে থাকি। আমার চোখ থেকে এবারে জল এলে আমি তোমাতেই নিমজ্জিত হই। অভিসার। হাঁটছি আমি। আমার ভেতরে হাঁটছে আরেকজন। চিহ্নিত স্থানে পৌঁছুতে হবে। নয়ত মিলন হবে না। কার সঙ্গে কার মিলন? আমার সঙ্গে আমার। আমার বাইরের সঙ্গে আমার বাইরের।

আমার ভেতরের সঙ্গে আমার ভেতরের। আমার বাইরের সঙ্গে আমার ভেতরের। আমার ভেতরের সঙ্গে আমারই বাইরের। এত আশা এত শ্রম এত আকাঙ্খা। মনে হয় এই বুঝি পথ শেষ হয়ে এল। এবার মধুর মিলন। কিন্তু কই। শেষ হয়েও হয় না যে। চিহ্নের নামগন্ধ নেই। আবার কিছু অনুচিহ্ন দেখিয়ে সে সরে গেছে অন্তরালে। জল শেষ হয়ে বরফ। বরফের ঘনত্ব বেড়ে বেড়ে তার রঙ পালটে যায় বুঝি। বাদামি হয়ে ওঠে। যেন রক্ত লেগেছে। অভিসার ভুলে যেতে হবে এইবার।

এই চরম ঠান্ডায় আবার বুঝি সেই ঘূর্ণি ফিরে আসে। অবাক। কিন্তু ঘুরে আসে। আমি তার পদচারণা শুনতে পাই। আমি তার লাস্যে ছড়িয়ে পড়া দেখতে পাই। আমি তার অনুরণন অনুভব করি মর্মে মর্মে। আমি কোথা থেকে শুরু করেছিলাম ভুলে যাই, কোথায় রয়েছি অনুমানেও আসে না, কোথায় গিয়ে ঠেকতে পারি স্রেফ জানিনা জানিনা। তবু একটা অস্তিত্ব। যে বয়ে চলেছে তারই ভেতর আরেকটা অস্তিত্ব। সে হয়ত আরেক আমি কিংবা তুমি যা আমারই প্রতিফলন। এই চক্রাকারে ঘূর্নির উপর থেকে আরও উপরে উঠে যাওয়ার মধ্যে আমি মিশে আছি। ঘুরছি বনবন করে। আর দেখছি বরফের রঙ কেমন পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। আমি আমাতেই মৈথুনে প্রবৃত্ত হই। খবেরর কাগজটা নাকের সামনে দুলতে থাকে। অসার। সে তো সামান্য কয়েকটা ঘটনা মাত্র। আমি ঘটনাতীত হতে থাকি।

নীলাব্জ চক্রবর্তী

তোমার আগে এই কাঁচের ঘরটায় অন্য কেউ বসতো

অ্যাতো যে ওম হোলো
টুকরো হোলো
হাঁসকল ফাঁসকল পেরিয়ে গ্যালো
তবু
খুললো না জানলার ঋতু জুড়ে
যে বইদুটো ওখানে ছিলোই না কখনো
অথচ
জাড় কেটে কেটে
ছাপানো স্মৃতির মধ্যে
বড়ো হোলো
সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের খপ্পর. . .

ভেঙে ভেঙে জাস্টিফাই করছে আর শীত পড়ছে। আর ভারী হয়ে আসছে টেবিলের রঙ। আর লম্বা একটা ফোটোজেনিক দুপুর পাশ ফিরবে। অন্য কোথাও একটা মার্ক অ্যাপলবামের কথা আসবে আসবে। একটা সার্বিক ভাঙচুর। ফ্রেম করছে ইন্টারভিউয়ের একটা প্রশ্ন - - -

সম্প্রতি মার্ক অ্যাপলবাম নামের একজন সঙ্গীত / ধ্বনি গবেষক / বিজ্ঞানীর কাজ দেখছিলাম সাক্ষাৎকার সমেত। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। নিজে অদ্ভুত কিছু যন্ত্র বানিয়েছেন। নতুন রকম স্বরলিপি। চূড়ান্ত পরীক্ষামূলক। সেইসব স্বরলিপি, বলা যায়, নতুনরকম ভিস্যুয়াল আর্ট প্রায়। নতুন ডাইমেনশন। ওঁর সঙ্গীত / ধ্বনি নিয়ে চূড়ান্ত গবেষণা বা পরীক্ষা- নিরীক্ষার কর্মকাণ্ডের ভিডিও ফুটেজ দেখতে দেখতে আমার কিন্তু শুধু রাহুলদেব বর্মণ না, মিস্টার বিন- এর কথাও মনে পড়ছিলো। আপনি এই নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাইবেন?

* - * - * - *

একটা ড্রয়িংশিটেরও স্মৃতি থাকে
লতাপাতা থাকে
চেয়ার থেকে চেয়ারে
গড়িয়ে যাওয়া য- ফলা
দেখতে দেখতে
দাঁড়িয়ে যান একজন বাইকালার শীতকাল
লেখার ওই হাতে
হাতের লেখা ত্যামোন ফুটবে কিনা
কথা বলা কবিতায়
ভেঙে ভেঙিয়ে
কম পড়ছে ক্রিয়া
অথবা
ধ্বনিইইই ফেলে দিচ্ছে
আর ভরে যাচ্ছে
বলবয়ের বেগানা উঠোন. . .

ফেসবুক থেকে - - -

এক নং তিনি - - - নীলুবাবু, লাভ ইয়োর ওয়াইফ। লাভ ইয়োর ডটার। লাভ পোয়েট্রি লেস।

সে - - - হুম... দেখি. . .

এক নং তিনি - - - মনে রাখিস, ও মাগী কিচ্ছু দেয়না। স্রেফ নেয়। সবটা।

অফিস – কাঁচের জনৈক ঘর থেকে - - -

দুই নং তিনি - - - দ্যাখো, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে... তোমরা কাজ করো... লড়ে যেতে হবে... হ্যাঁ... আর কিছুদিন... মনে হচ্ছে সব ঠিক হয়ে যাবে. . .

সে - - - স্যার, কার্ভ- টা তো পড়ে যাচ্ছে ক্রমশ... প্রথমে দু'- তিন বছর যাবত ইনক্রিমেন্ট বন্ধ... তারপর শুরু হোলো আপনাদের স্যালারি কার্টল করা... আরও পরে আমাদের স্যালারি পার্টে পার্টে হতে থাকলো... অ্যাতো লেট পেমেন্ট... কতোরকম কমিটমেন্ট থাকে... তার ওপর শোনা যাচ্ছে কিছু লোককে নাকি ছাঁটাই করা হবে. . .

দুই নং তিনি - - - হুম... ঠিকই... কিন্তু... আমার মনে হয়... কার্ভটা বটমমোস্ট পয়েন্ট টাচ করে ফেলছে... হয়তো শিগগিরই ইট উইল গো আপ উইদ টাইম... সব ঠিক হয়ে যাবে... বুঝলে... ধরো আর ছ'মাস... নতুন প্রোজেক্টগুলো এক এক করে চালু হলেই. . .

এরপর যেটা হয়...এই এক নং তিনি আর দুই নং তিনি. . .এই তিনিদের মাঝে এসে দাঁড়ান একজন দেড় নং তিনি। ভাবছি একেই ল অব অ্যাভারেজ বলে কিনা আর সেই দেড় নং তিনি বলতে থাকেন. . .

দেড় নং তিনি - - - বরং একটা ত্রিমাত্রিক গ্রাফ- এর কথা এলো। সময়ের সাপেক্ষে শুধু এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের অবস্থা বা অবস্থানই নয়... চাহিদাগুলোকেও আরেকটা তৃতীয় অক্ষ বরাবর প্লট করে যেতে হবে... পরপর ভাবতে হবে সাবপ্লটগুলোর কথা... আর একটা কথা, বাজারকে তুমি অস্বীকার করবে কী করে? ভালো কথা, তোমার বাংলা মিডিয়াম না ইংলিশ? বাংলা বোধহয়... না? মাধ্যমিকে অ্যাডিশনাল অংক ছিলো তোমার? বা উচ্চমাধ্যমিকে স্টাটিস্টিক্স? তা না হলে অবশ্য তোমার সিলেবাসে কখনোই সেট থিয়োরি থাকার কথা নয়... ছোট ছোট কয়েকটা বৃত্তের কথা ভাবো... একটায় লেখালেখি... একটায় ভ্যানোপ্রসাদ... কোনোটায় আবার অফিস... কোনোটায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস... অর্থনৈতিক ভারসাম্য... কোনোটায় সামাজিকতা- বন্ধুত্ব. . . এবার এই বৃত্তগুলো কাছাকাছি থেকে পরস্পরের সাথে ওভারল্যাপ করছে... ওই ওভারল্যাপিং অঞ্চলটুকুতে তোমার অস্তিত্ব... ওই নির্দিষ্ট জোনটুকু। এবার এই বৃত্তগুলো ছোটবড় হচ্ছে বা পারস্পরিক বিকর্ষণের কারণে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে ধরে নাও। জ্যামিতিকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ছে ওই ওভারল্যাপিং অঞ্চলটুকুর ভূগোল। টেরেবেঁকেতুবড়েছিঁড়েছড়িয়ে যাচ্ছে তোমার অস্তিত্ব... তোমার ভারসাম্য। তারপর এই বৃত্তগুলো আলাদা হতে হতে ক্রমে অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়লো আর কোনও যোগাযোগ থাকলো না পরস্পরের সাথে... তখন... হ্যাঁ... আর ওই ওভারল্যাপিং অঞ্চল বলে কিছু থাকলো না... তুমি একজন খাঁটি সত্যিকারের কোথাও- নেই- মানুষ হয়ে গেলে... আ ট্রু আউটসাইডার ইন

এভরি অ্যাসপেক্ট. . .

* - * _ *

বসন্তপর্যায় গেল আমাকে করলে না তুমি ভালো
ছায়ার প্রকোপ থেকে ছাড়িয়ে আনলে বেতের শরীর
দু'ধারি অর্থ দিয়ে মন্থিত হলে আর কেলাসিত হল নিরাবেগ
এই তো বিপর্যয় বাকীটুকু বোরিং পৃথিবী

বাকীটুকু সূঁচের ফুটোয় স্মৃতি পারাপার
ঝড়ের মধ্যিখানে ঝড়ের আওতা থেকে দূরে
রেখে দেয়া চিবুকের নিবিষ্টতাটুকু
করেছিল চিকচিক দূরে ও

চোখের ছাউনি জুড়ে জল ছিল
নাকী বালি - - আঘাত জানেনি
আঘাতের শূন্যতা থেকে শূন্যতার ভেলোসিটি থেকে
খুব পালিয়ে যাচ্ছিল বেহালার ছড়

- - - সব্যসাচী সান্যাল

হ্যাঁ সব্যদা। যা বলছিলাম। তো এই ছায়ার প্রকোপ আর বেত বেতস ভাবি। কথা হোলো, প্রকোপটা ক্যামোন রাগী রাগী আর অসুখী টাইপ লাগছে দেখি। আর নিরাবেগ কেলাসিত হচ্ছে দেখে হেভি লাগলো। ফ্রিজের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে নিরাবেগ একটি খুব শরৎকাল লিখেছিলাম মনে পড়লো। তুমি গুলমোহর... রিপিট হচ্ছে প্রায় কখনো পড়োনি। সে যা হোক, এখানে যে নিরাবেগ কেলাসিত হচ্ছে মন্থনই তার কারণ ভাবছি। কিন্তু আমার যা যা হয় হতে থাকে তা হোলো এই যে মন্থিততে আটকে যাই আমি। মন্থর হয়ে যাই। ক্যানো ভালো লাগছে না? বরং বাকীটুকু। বাকীটুকু সূঁচের ফুটোয় স্মৃতি পারাপার আমায় সেই চিবুকের নিবিষ্টতা এনে দিচ্ছে টের পাই। একটু

একটু মনে পড়তে থাকে চিরকালীন বলে একটা বাড়ি হয় আর কারা যেন কোথায় সেই থুতনির স্থাপত্য বসায় ইত্যাদি। এমনকি সূঁচের ফুটোয় একটু ফুটে যাওয়ার কথা মনেও এলোনা প্রথমে। নাকি এলো? পরে? ফুটো হলেও সূঁচের পাশে বসতে একটু আহা উহু ইঞ্জেকশনের স্মৃতি পারাপার করছে দেখি। নাকি ব্লাড টেস্টের? আমার আবার ব্লাড গ্রুপ এ পজিটিভ। ভ্যানোপ্রসাদের বি পজিটিভ বলে সে একটু মন খারাপ করে দেখেছি। আচ্ছা সে কথা থাক এখন। নাকী বালি আঘাত জানেনিতে উঁকি দিই একটু। ওহ্! কতো কিছু যে দেখতে পাচ্ছি। তবে আসল কথাটা হোলো আমি এখন ঠিক কী দেখতে চাইছি? ক্যালাইডোস্কোপ না আয়না? ঠিক কী দেখতে ভালো লাগবে আমার এখন? ডি এস এস আই (ডায়নামিক সয়েল স্ট্রাকচার ইন্টারঅ্যাকশন?)- এর ওপরে একটা ছোট্ট ক্লাস করতে গেছিলাম কিছুদিন আগে একবার। কংক্রিটের রাস্তা দিয়ে দৌড়লে আমরা তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হব, নাকি একই ভেলোসিটি নিয়ে বালির ওপর দিয়ে দৌড়লে? কোনও স্ট্রাকচারাল মডেলের সাপোর্ট ফিক্সড বা পিনড না হয়ে যদি স্প্রিং হয় তবে ক্যামোন? ওর সাপোর্ট রিঅ্যাকশনগুলো (ভাবো একটা বাড়ির কলাম বা পিলারের লোডগুলোর কথা) বাড়বে না কমবে? ওই স্প্রিংগুলো যদি সফটার বা হার্ডার করা হয় আস্তে আস্তে তাহলেই বা কি হওয়া উচিত থিওরিটিক্যালি ? এইসব নিয়ে নানারকম হচ্ছিলো আর লিখতে শুরু করেছিলাম. . .

একটা চৌম্বকক্ষেত্র
যা কখনো ছিলোই না
অথচ বালির ওপর দিয়ে
তার জন্য
ভাষার গলি উপগলি ছিঁড়ে
বারবার ফিরে
পতনশীল বস্তুর সূত্রাবলী আসছে
আর একটা নীল গিরি হচ্ছে কোথাও
স্থিরচিত্রের জন্য
নির্ধারিত প্রোজেকশন
ওইখানে ফিকে হয়ে আসে
আমাদের বাকি থেকে যাওয়া সইসাবুদ

লক্ষ করুন
পুরনো একটা ঠাণ্ডা আলোর ক্ষেত থেকে

ফের ঝুঁকে আসে
খুব ফেলে যাওয়া সাদা পেন্ডুলাম
তবুও
সফট স্প্রিং বলতে কিছুতেই
নরম বসন্ত মনে পড়বে না আপনার. . .

এখন এই বসন্ত আর সেই পর্যায় নিয়ে আরেকদিন। কীভাবে এর সাথে একটা ছবি এলো নষ্ট হয়ে যাওয়া সময় এলো কোটেশন এলো আর সব মিলিয়ে অংশ হয়ে গ্যালো একটা দীর্ঘ লেখার সেটা আরেক কাহানি। কিন্তু আপাতত বলি, এখন এই পুরো কাহানি উঠে এলো শুধু ওই নাকী বালি আঘাত জানেনিটুকু থেকে! ভাবো কাণ্ড। তবে এরপর লেখাটায় আসল মজাটা হোলো আঘাতের শূন্যতা থেকে শূন্যতার ভেলোসিটি থেকে... ওহ... একটা বায়ুশূন্য স্থান... আঘাতের শূন্যতা... একটা মাস পার্টিকলের এস্কেপ ভেলোসিটি... একদম চুপ করিয়ে দেয়... আর আঘাতের শূন্যতা থেকে শূন্যতার ভেলোসিটি থেকে খুব পালিয়ে যাচ্ছিল বেহালার ছড় নিয়ে আর কী লিখবো বলো? একে তো আমি এই খুব শব্দটার ব্যবহার তোমার কাছ থেকে শিখেইছি এইভাবে আর তার ওপর আমার কাছে এই পুরো কবিতাটা একদম খাড়া টানটান মার্চপাস্ট চাও বা নাচাও দাঁড়িয়ে আছে এই শেষদুটো লাইনের ওপর ভরে নির্ভরে। শুধু দূর থেকে সেই দেখাও বেহালা কাঠের গাছগুলি একঝলক যেন দেখতে পেলাম... এখন বসন্তপর্যায় থেকে জুলাইয়ের ছুটির গুণ আর কতোদূরেই বা. . .

(কৃতজ্ঞতা – স্বদেশ সেন)

* - * _ *

এক বোতল বেলীফুলের সাথে আপনি পাচ্ছেন ছ'টা শ্যাম্পুর পাউচ এক্কেবারে ফ্রী... আসুন আসুন এগিয়ে আসুন... হ্যাঁ হ্যাঁ এইভাবে আপনার টেলিভিশনের পর্দা ফুঁড়ে এইদিকে আমাদের এই দুনিয়ায় চলে আসুন... ভল্যুম একদম কমিয়ে শূন্য করে দিন আর নজর রাখুন পর্দায় ফুটে ওঠা চিহ্ন সঙ্কেত আর নির্দেশাবলীর দিকে... মনে রাখবেন স্টক কিন্তু সীমিত... এই সুযোগ কোনোভাবেই হাতছাড়া করবেন না. . .

ছায়ার ভেতর দিয়ে

বেলুনের বাড়ি
অর্ধেক ফেরা হোলো
হাত- পা হোলো ন্যারেটিভের
জানলায়
মেলে দেওয়া গতকালের ধীর
লেগে আছে. . .

ক্রমশ একটা সাইকেল। ফুটে ওঠা। স্পোকে জড়িয়ে যাওয়া ইতস্তত আহা উহু গভীর অগভীর ক্ষত আর নিরাময়। ততক্ষণ নামের একটা প্রান্তিক সময়। আমাদের দেওয়াল জুড়ে ফিকে স্লোগান। স্নায়ু খুলে রাখা। ফুঁ দিচ্ছে একটা গাঢ় আয়না। মনে আছে? লো অ্যাঙ্গেল থেকে ক্যামেরা অপারেট করার কথা ছিলো থ্রুআউট দ্য টেক. . .

অনুপম মুখোপাধ্যায়

উৎকীর্ণ রাত্রিলিপি

লস্ট ইন ট্রানস্লেশন

।
ম্- মা- মেগো জল। ধুচ্ছে ট্রানস্লেশনের
ম্- মাতা ও বগল। m-motherfucker water। ভরছে
ট্রানস্লেশনের পত্নী ও যোনি। kamine pani । ঢাকছে
ট্রানস্লেশনের কন্যা ও বোঁটা

।
~~সুরক্ষিত~~ দ্বীপ। ঘিরছে
খামারবাড়ির ~~আসল~~ ধারণা। হারানো থেকে
পালিয়ে আসা চুনকামঅলা. . .
~~ওই তো~~ হাঁটছেন! ~~ওই~~ ফলকে. . .
লেখা হচ্ছে ~~সম্মানিত~~ নাম। নিভাঁজ। কড়া। নামের
ম্- মতো নয়
।
সাদা। লম্বা। ধুলোয় ছাওয়া
শব্দকারখানা। ক্লোন। সাইক্লোন। পাতা ঝরছে
ম্- ম্- মালিকানায়। ১ হচ্ছে না
।
ভাষারাষ্ট্র। কবরকে ~~কেউ~~
~~অনুবাদের~~ প্রদেশ বলছে না
।

সমাধিক্ষেত্র আমাকে খুব টানে। তবে সেটা নিছক ম্যাদামারা কবরখানা হলে চলবে না। তাকে হতে হবে রোদে ঝলমল, এবং সাদা রঙের খুব প্রাবল্য থাকবে। অথবা হতে হবে বহু পুরনো, অব্যবহার্য, এবং তাতে চাঁদের আলো কিছু কেরামতি দেখাবে। সম্ভবত এই পছন্দের ব্যাপারে আমি অনুপম নই, কারন অনেকেই এটা পছন্দ করেন। 'মুল্যাঁ রুজ' উপন্যাসে তুলুজ লত্রেকের এক বন্ধু তার জানালা খুলে রেখে মেয়েদের বিছানায় করত, কারণ কবরখানার দৃশ্য নাকি মেয়েদের কামপ্রবণতাকে আরো জাগিয়ে তুলত।

এবং একেকটা কবর একেকটা বর্ণ, পুরো কবরখানাটা একটা বর্ণমালা- আলফাবেট। ক্রম অনুসারে সাজানো নয়, কারণ জীবন ক্রম মানে না, মৃত্যুও ক্রম মানে না।

সত্যি বলতে কী, ভাষা কাকে বলে জানি না, কারন ভাষার বাইরে ও ভিতরে কী আছে আমি জানি না। জীবন জানি না, মৃত্যুও জানি না। এর মধ্যেই লেখালেখির দুঃসাহস করি। লেখার ব্যাপারটা নামের মোহ কেটে গেলে সত্যিই সাহস ছাড়া আর কিছু থাকে না। যে কোনো কবিতাকেই তখন অনুবাদ মনে হয়। ভয় করে, প্রতাপশালী হওয়ার জন্য লিখে যাচ্ছি না তো! আমিও কি ওই প্রবল কবিদের মতো

ভন্ডামি করছি! সংস্কৃতির জোরে ভাষাকে দাবড়াচ্ছি! প্রকৃত কবিতা তো সংস্কৃতি আর ভাষার একীকরণে পৌঁছয়, তাই না? এই কবিতায় সেই বোধটা খুব কাজ করেছে।

কবিতাভাবনা আর অনুবাদচিন্তার মধ্যে একটা ভীষণ অনিশ্চয়তাও উগরে দিতে চেয়েছিলাম এই কবিতাটিতে। সেই অনিশ্চয়তা আমার মধ্যে জেগে ওঠে যখনই আমি নিজের ভাষা আর সংস্কৃতির ব্যবধান নিয়ে ভাবি। সন্দেহ করতে থাকি, আমি খাঁটি থাকছি তো! নিজের ব্যক্তিগত আর নিজের সমষ্টিবোধের মধ্যে একটা নিষ্পত্তি হচ্ছে তো! নাকি... পুরোটাই শুধু কবি- কবি খেলা!

নামটা মজা করে নিয়েছিলাম সোফিয়া কপোলার সিনেমা থেকে। সিনেমাটা আমার তত প্রিয় নয়, যতটা ওর নাম। নামকরণেই সিনেমাটা জিতে গেছে।

আর, শেষে বলি, নিজের কবিতা নিয়ে কথা বলতে বসে ১০০ % সত্যি বলা পৃথিবীর একমাত্র অসম্ভব কাজ।

অগ্নি রায়

গাছের ছায়ার ত্রিকোণমিতি

প্রাইভেট টিউশন

ঘড়ির কাঁটায় সন্ধ্যা ভেঙে আসছে আর ল্যাব নোটবুক থেকে চোখ মারছে শুকনো ফুল। জানলার বাইরে ল্যাম্পপোস্টের কাছে কেউ দাঁড়িয়ে ঘাতকের সতর্কতায়। এসবের মধ্যেই কখন যেন গুমফার বিষণ্ন ঘণ্টার মতোই সান্ধ্য বেল বেজে উঠল। চায়ের কাপে তলানি হয়ে জমছে শর্করার মতো মিঠে অপমান। খামের দোহারা শরীরে ছাত্রীর মায়ের পাপক্ষয়, কখন ওম দেবে ? শেষ পরীক্ষায় যাই ঘটুক, সিগারেটের দোকানের বকেয়া চুকিয়ে দিও বিপর্যস্ত ঈশ্বর

তখন সবে হামা দিছে নব্বই সাল । সকাল থেকেই ঘুম ভাঙ্গার যন্ত্রণায় মাথা ধুম। আকাশ বেকার ভাতার মত ম্যাড়মেড়ে রঙ নিয়ে পাশের গলিতে উবু হয়ে বসা । যুগপৎ হিসি ও হাই পায়। দিনের প্রথম নিকোটিন আরো একটি দিনের তেতো তৈরী করে ।

ভুবন যে আসলেই একটা ছোট গ্রাম এবং বিপিও, কল সেন্টার নামের সব আশ্চর্য প্রদীপ সারারাত জ্বলতে জ্বলতে কিছু ভিটামিন যুগিয়ে দিতে পারে কাঠবেকারের মাসান্তে, জ্যোতি- অনিল যুগে তখন সেসব সিনই ছিল না । না খোলা, বড় বড় কম্পিউটার, বাক্স সমেত পরে থাকত পোস্ট অফিসের অন্ধকার ঘরে। তথ্য তখন তথ্যের জায়গায় আর প্রযুক্তি আটকে প্রযুক্তিতেই । হাজারো খুচরো কাজে উপায় করার কোনো সুযোগ নেই । ফলে ভরসা বলতে গাছের ছায়া দীর্ঘ হবার ত্রিকোণমিতি, জনৈক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মেয়েকে লেখা চিঠি, ব্যাঙ এর ঠান্ডা রক্ত সংবহন চামচে করে গিলিয়ে (যেখানে যেমন) একটা সাদা খাম! ঈশ্বরের রঙ, সেই তখনই জেনেছি, সাদা!

তো, ব্যাপার হলো, প্রাইভেট টিউশন, সেই সময়দাগ। সেই নাছোড় যাপন। মাস মাইনের তারিখ তৈলাক্ত লাঠিতে চড়া বাঁদরের

মত যেখানে ওঠাপড়া করে। চায়ের সঙ্গে একটি দয়ালু সিঙ্গারা যেখানে হইহই ফেলে দেয় ।

আগেই বললাম, এই লেখাটি সেই সময় বসন্তের দাগ দুষ্ট। এই লেখার স্পেসে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে নষ্ট চেষ্টা, যৌনতার বয়েসোচিত ভাপ, অন্ধকার ল্যাম্প পোস্ট। অসময়ের অতর্কিত ফুল রাখার সেরা জায়গা যে লম্বা চওরা ল্যাব নোটবুক অথবা টেস্ট পেপার, তা প্রাইভেট পড়ানো হাড়গিলে মাস্টারের অধিক কেই বা জানে! কেননা তা বহুবার কাঁটার পলকা চেয়ারে (ভাগ্যে থাকলে সোফা) বসা মাস্টারকে যে চোখ মটকে বলে গেছে - - - চমৎকার! লেগে পরো তুমিও এবার!

সময়কে কখন সবচেয়ে দীর্ঘ মনে হয়? বাইরে যখন উপর্ঝরণ বাদলা, অথচ আপনাকে ফিরতে হবে ছাতাহীন (কেননা সেটি ফেলে এসেছেন অন্য কোনো টিউশন বাড়ি) বিশুদ্ধ মাইল, বহু দুরে সেই শুকনো মোজা, রাম এর বোতল আর বেসুরো গান । আপাতত পেরোতে হবে নর্দমা প্রপাত । স্থবিরতা তুমি টিউশন বাড়ির ঘড়ি থেকে কবে যাবে বলো তো?

এমন ভাবেই গরচা রোডের একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখেছিলাম শীত রাতের ল্যাম্প পোস্টের নিচে একটি ছায়া শরীরকে। দু পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে যে চোখে চোখ রেখেছিল । কাছের একটি নার্সিং হোমে বোধহয় শিফট চেঞ্জ হচ্ছিল সে সময় । সেই কালো রাতটিকে আরো অনিশ্চিত করে দিয়ে ঘন্টা বেজে উঠছিল । তার কথা ভালো শোনা যায়নি । পরে জেনেছি, ছেলেটি ছিলো আমার ছাত্রীর রোমিও! কিন্তু কবিতায় তার ঘাতকপম দীর্ঘ নিঃশ্বাসটুকুই কেবল চলে এলো! কেন, তা ঠিক করে বলা মুশকিল । সাউথ পয়েন্ট এর ক্লাস সেভেনের একজন মা ও এসে বসেছেন এই লেখার স্পেস জুড়ে। একুশ বছরের টিচারের জন্য যার শাড়ির আঁচল অকৃপণ ভাবে ঝরে পরতো কতো না ছমছমে সন্ধায়। তার ব্লাউসের লালে নেমন্তন্ন কার্ড সাঁটা ছিলো !

ঋষি সৌরক
আধকোলাজ

খুন একটা আর্ট

কাউকে মেরে ফেলা অত সোজা না-
ইনফ্যাক্ট কোনো শিল্পের মজা সেখানেই
যখন সেটাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করা যায়
স্বাদের ইপ্সা ঝোলে অতৃপ্ত রসনায়

ধরো তোমাকে সোজা মৃত্যু দিলাম না

একটু ভেঙ্গেচুরে দেখালাম

ডানহাতের জায়গায় বাঁ পা টা জুড়লাম
দুই আঁচড়ানো খোব্লানো স্তনে
দু'দুটো কান। হিমশীতল রোমকূপ এফোঁড়- ওফোঁড়
পায়ূ দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে এলাম গলায় -
ছিঁড়ে ফেললাম যত স্নায়বিক সংযোগ
ইচ্ছেমতন হর্মোন দিলাম ঢেলে
জ্যান্ত হার্ট তুলে নিলাম বুকের গভীরতা ভেঙ্গে
আর নাভি উপড়ে চেটালাম কপালে
দুগালে অজস্র চুম্বন- ছোয়াচে রোগ আর নিঃশব্দ ক্ষত

ঠিক যেন সাবলীল অ্যাবস্ট্রাক্ট
যেভাবে ভালোবাসা আসে
কি ভীষণ যন্ত্রণা -
তবু ভালোবাসি, কারণ

খুন একটা আর্ট -

খুব কাছাকাছি মৃত্যু ও আমি
বিরামহীন কোলাজ কোলাজ

যা কিছু স্থির যা কিছু পূর্বনির্ধারিত তা কিছু বোরিং । একঘেঁয়ে সুখ বা যন্ত্রণার ভেতর একটা চর্বিতচর্বন ফর্মুলাপালনের তাগিদ চলে আসে। চারদেয়াল কে যদি ফ্রেম ধরি, আর মাত্রাকে তিন – সয়ে যাওয়া চোখ এদের কম্বিনেশন এ বিশ্বাসী। মাত্রা আর দেয়ালকে অসীমতা দিলে সে কম্বিনেশন চিরন্তন হয়ে ওঠে। এই যে মানব দেহ – মানব মন দুই যমজ ভাই- বোন, এরা কিন্তু অঙ্গাঙ্গী বা মনমানিময় ওতপ্রোত ! শরীরের বিপরীত শব্দ অনেক ক্ষেত্রে মন – অনেক ক্ষেত্রে অশরীর, মানুষ সুবিধামত এই শব্দগুলোকে ইউজ (বলা ভালো অ্যাবিউজ) করে, কারণ শব্দে কোনও পাসওয়ার্ড নেই; মুখ খুললেই গন্ধরাজ।

ব্যাপারটা খুব ডায়নামিক। যাকিছু বটে তাকিছু সেভাবেই কেন ? কেন ওভাবে না ? সৃষ্টি- ধ্বংস- তাণ্ডব- লাস্য এসবের ব্যালেন্স করতে গিয়ে আমরা সংজ্ঞা'কে ডিফাইন করি। যে উমুক ভাবে উমুক জিনিস বললে, তাকে সংজ্ঞা বলা হয়। পার্থিব অবস্থানগুলি বরাবরই মাধ্যাকর্ষণ অবদমিত ...যদিও কল্পনার শূন্যস্থানে চলতে থাকে রকমারি ভাঙ্গাচোরা। তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ "খুন"। এখানে স্বঘোষিত রাজ্যজয়ের একটা দম্ভ আছে। কোনরকম নিষেধাজ্ঞার চৌকাঠ বা পাসওয়ার্ড ডিঙ্গিয়ে স্বাধীনতার ফ্লেভার পেতে হয় না। এখানে সবরকম নিষিদ্ধ বস্ত বুফে সিস্টেমের মত সাজানো – যতখুশী উপড়ে নাও। আর সেকারণেই তথাকথিত মানবদেহটি (নারী- পুরুষ উল্লেখ করি নি বটে, তবে নারীশরীর ধরে নেওয়া যায় নিউট্রালি) ভাঙ্গতে থাকি মনমত! তার শুধু দেহ না যমজ মনকেও এফোঁড়- ওফোঁড় করবার বহুপ্রতিক্ষীত ইপ্সা প্যাশনেট আকার ধারণ করে।
আপনি হয়তো ভাববেন কতখানি বিকৃত এবং গা- ঘিনঘিন এই চাহিদা! কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার কল্পনায় রক্ত ঝরে না বা ততটুকুই ঝরে যতটুকু আমি চাই। আমার কল্পনায় মানবদেহের প্রতিটা অংগপ্রত্যংগের চারুকাজ ছুঁয়ে- খুলে- শুঁকে- চেটে দেখার বাসনা অসম্ভবকে একটা

খাত দেয়। সেই কল্পনাতেই আমি ছুঁই একটি মন – শুধু ছোঁয়া না তাকে রীতিমত উদব্যস্ত করে যাপন চলে অহরহ – যতক্ষণ না আশ মেটে, যতক্ষণ না আমি তৃপ্ত হই – যতক্ষণ না দেহ ও মন অবশ হয়ে আসে আমার। কারণ যে শরীর ও মনকে কল্পনার কুঠুরীতে নিয়ে গিয়ে চলে আমার অসম্ভব সাধন, আমি চাইলে তাকে প্রাণ দি আবার চাইলে নিষ্প্রাণ করে দি ... আমার কল্পনা শুধু এবং শুধুমাত্র আমার বশীভূত। আর কোনও বাপের বা কোনওরকম বাস্তবের অঙ্গুলিহেলন এখানে ব্যর্থ।

প্রতিটি সৌন্দর্যের ভেতরেই লুকিয়ে থাকে অজস্র কদর্য ছাপ ... সেই "কু" গুলি খুঁজে পেতে আমি স্কুবা ডাইভ করি নিজের ভেতর ! খুঁজতে খুঁজতে ঘাঁটতে ঘাঁটতে তোলপাড় করা মনসমুদ্রে আমি স্থির হয়ে পড়ি, অনুভব করি "সুন্দর" আর "অসুন্দর" এর ফারাকটুকু ভীষণভাবে স্বার্থপর...আদতে ছড়ানো ছেটানো নুড়ির দেশে সবপাথরই মুক্ত হয়ে ওঠে না তবু প্রত্যেকে নিজের মত সুন্দর – নিজের মত কুৎসিত। এরা পরস্পরের ছায়ামাত্র, আলোকপতন এবং আলোকপথে বাধাপ্রদানকারী বস্তুটির ওপর নির্ভর করছে ছায়া টি কিরকম হবে, সদ্ (Real) না অসদ্ (Virtual)।

এভাবেই একটিদেহ কে তথাকথিত ভাবে স্যাম্পেল করে আমার কল্পনাগারে চলে চিরুনিতল্লাশ। উল্টে- পাল্টে মাত্রা বদলে কিমবা নানাভাবে কম্বাইন করে একটা সৃষ্টিশীল (আপেক্ষিক শব্দ, ধ্বংসাত্মক ও বলা যায় – You are the real image) সীমান্তে পৌঁছতে চাই। যেখানে ইন্দ্রিয়কামী মন ক্রমশ ইন্দ্রিয়ের খোলস ছাড়িয়ে একমেবাদ্বিতীয়ম বোধে স্থিত হয়। খুন এবং ভালোবাসা হয়ে ওঠে সমার্থক ...আর পাঁচটি ফলন বা প্রতিফলনকেও সেই গুণে সমার্থকে ফেলা যায়। এই বোধ এই অব্যক্ত আনন্দ এই স্বয়ংজয়ী সুখ আমাকে বারবার অনুপ্রাণিত করে আরো মোচড় দিতে ...আরো ছিন্নভিন্ন গবেষণায় আসক্ত হতে শেখায় – আর আমি ইচ্ছেমত খুন করি – ভালোও বাসি – Because I Rule In My Art

পরের পৃষ্ঠায় যাওয়ার জন্য ওপরে "কাব্যানালিসিস" মেনুতে ক্লিক করুন

What peaches and what penumbras! Whole families shopping at night! Aisles full of husbands! Wives in the avocados, babies in the tomatoes!--and you, Garcia Lorca,

what were you doing down by the watermelons?

Cough from your fifteenth cigarette [কাব্যানালিসিস](#) **before creeping noon. Light another.**

রবীন্দ্র গুহ

দীপঙ্করের এগিয়ে হাঁটা, দর্শন, এক্সটেন্ডেড টেকনোলজি ও ধারামুক্ত কবিতা 'থান'

কবিতা সম্ভাবনার কারুশিল্প নয়। ইমোশনালি চার্জড ড্যামেজড্ হৃদয়ের ভাবকল্প যা ক্ষণে দৃশ্যমান ক্ষণে অদৃশ্য বা যে হাতে প্রেম সেই হাতেই খুন্নন্ - - উঁহু তাও নয়। কবিতা, স্বতঃশ্চল রক্তমাংসের মানুষের বুকের ছোপচিহ্ন - - মনখারাপের ফিচলেমি - - লোভক্ষোভ তথা স্মৃতি- স্বপ্নের উসকানি। সময়টা ২০০০ সাল। দিল্লি হাটের বাইরে পানশালার ছ গজ তফাতে ওল্টানো তেলের পিপের ওপর পায়ে পা জড়িয়ে বসে কবি দীপঙ্কর দত্তর সঙ্গে দুষ্প্রবেশ্য মেধাজগত নিয়ে ছটফটানি চলছিলো। দীপঙ্কর কাঁধে চাগাড় দিয়ে বলল : একটা কবিতা নামিয়েছি, শুনুন - -

লাইলাহাইল্লিল্লাহ
হজরৎ বীর কী সলতনৎ কো সলাম
বী আজম জের জাল মসল কর
তেরী জঞ্জীর সে কওন কওন চলে
মোর এক রেতের ভাতার যখন রেতকাবারি কোতলায় লুঙি বান্দে উয়া বৈঠা মোতে
যোগিনী চৌষটের দুই হাজার আটচল্লিশ ঝিলিক এঁটুলি দাঁত তারে ছ্যাঁকে ধরে

- - আরেব্বাস, একটু থামো কবি - - থামো - - তিষ্ঠ ক্ষণকাল - - এই নদীনালার ভাষা তুমি কোথায় পাইছ্য ? 'লাইলাহাইল্লিল্লাহ' - এডা তো আজানের ভাষা, মুয়াজ্জিনের বইশ্যাইল্লা ভাষা - -
দীপঙ্কর বল্ল - - আমার মাতামহ বঙ্কিমচন্দ্র গুহঠাকুরতার নিবাস ছিল বরিশালের বানারীপাড়া - -
- - কি কইলা মনু, তুমি তো আমাগো দ্যাশের পোলা। আমাগো মামাবাড়ি নত্তমপুর। বানুরীপাড়া খালের অই- পার। তুমি কি গ্যাছো অই দ্যাশে ?
- - না

সবটাই আমার কাছে অকল্পনীয়। যে মানুষটি কৈশোরকাল থেকে রুক্ষ খরখট্টা দিল্লির হা- আকাশ দেখেছে, খর আঁধিধূলা লু- বাতাস দেখেছে - আরাবল্লি পাহাড়ের দিক থেকে হঠাৎ হঠাৎ 'চিলো চিলো' চিৎকার শুনেছে, দারুবাজ হরিয়ানভি এবং ছ্যাকরা পাঞ্জাবীদের অকট্যে গালিগালাজ শুনেছে, ভাংরা নাচের ঠমকযুক্ত ইঙ্গিত দেখেছে, এতদব্যতীত কত চোরচোট্টা গুরমুখী ফৌজ - গালে টাল্কের গুঁড়োর উপর লালছোঁয়া পাঞ্জাবিনী স্ত্রীলোকসকল, নোংরা রাজনীতি - কী আশ্চর্য, সেই যুবক- কবির চোখে ছেঁড়া ছেঁড়া শতরঞ্চ - কাটা জোনাকির আলো - বানারীপাড়া - খালের পানি উথাল পাথাল - "কইগো বটঠাকরুন আইজ আর পোনা মাছ না পোনার মায়েরে ধইরেছি, হেমেন

কই ?”

কবি মাঝে মাঝে দ্বন্দ্বদীর্ণ। সেকারণ, তাকে সাহায্য নিতে হয়েছে ভিন্ন ব্যঞ্জনাময় আচ্ছন্ন একাধিক ভাষাশব্দের (হিন্দি, উর্দু, আরবী, পূর্ববঙ্গীয়)। যার ফলে ক্লাসিক্যাল রূপ পেয়েছে বিষয়। যথার্থ মান্যতা পেয়েছে ভূগোল। এখানে কবিতার টেক্সটটাই বড় নয়, বৈপরীত্বের অবস্থান অন্যতম। যেমন, জীবনের ক্রিয়াকর্ম, ন্যায়াচার, তর্ক- সিদ্ধান্ত, ইচ্ছামন্ত্র, জনশ্রুতি। কার্যসিদ্ধির শাবর মোহিনী মন্ত্র - যার শুরুয়াত, শুদ্ধত্ব, অত্যুচ্চরব, লিহাজ বাসনাসিদ্ধ করে, কর্মসফল করে। যদিও শাবর মন্ত্র শুধু হিন্দুরই আচার- আচরণের সঙ্গে নয়, মুসলমানদেরও চর্চার বিষয়। এই হৃদয়- জারিত উসকে দেওয়া শাবর মন্ত্রের একাধিক ব্যাপকতা তথা সিদ্ধি- নিয়ম আছে। দীপঙ্কর তার সৃষ্টিশীল বোধিধর্মে, শৈল্পিক ইচ্ছায়, সর্বব্যাপী চলমান সত্ত্বাস্বরূপের আপাত ভিন্ন ভিন্ন ভাষার বয়নে ‘থান’এর অসাধারণ রূপটি ফুটিয়ে তুলেছে। এই শাবর মন্ত্র মুখেমুখে ফেরে ওঝাদের, ফকির- ফাকরাদের, মৌলবী- মুর্শিদাদের, ইচ্ছাময়ীর অঘোরী সাধকদের । কিন্তু কবিতায় অতিপ্রাকৃত পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে দীপঙ্কর এহেন ইল্লজিক্যাল, অসম্বদ্ধ, ছেতরানো, পলিফোনিক পদ্ধতিতন্ত্রের সংকরায়নে কাতর কেন ? যদি চেতনার স্বর মূলাধারে স্বাধিষ্ঠান, তবে অবশ্যই শক্তির অন্যতম আধার ইচ্ছাজ্ঞানতন্ত্রক্রিয়া। ইহ বাহ্য।

এবার কবিতাটি পড়ে নেয়া যাক স্বয়ং, এবং স্বর্বব্যাপী চেতনায় প্রাধান্য দিয়ে - -

দীপঙ্কর দত্ত

থান

লাইলাহাইল্লিল্লাহ
হজরৎ বীর কী সলতনৎ কো সলাম
বী আজম জের জাল মসল কর
তেরী জঞ্জীর সে কওন কওন চলে
মোর এক রেতের ভাতার যখন রেতকাবারি কোতলায় লুঙি বান্দে উয়া বৈঠা মোতে
যোগিনী চৌষটের দুই হাজার আটচল্লিশ ঝিলিক এঁটুলি দাঁত তারে ছ্যাঁকে ধরে
কালীর ঝুমরার তালে চাঁদের এই কুহৈল খিলখিল শ্যাওড়ার জোনাক মিনসা তারার থান ওই
মাতঙ্গীর রেতকালের ভিগা নাটকাপাস পেরোয়ে যেওনি, এ জোনাক ভিরমি হেমেন ঠাকুরতারও ছেলো

বাবন ভৈরোঁ চলে
দেব চলে
বিশেষ চলে
হনুমন্ত কী হাঁক চলে
নরসিংহ কী ধাক চলে
নহী চলে তো সুলেমান কে বখৎ কে দুহাই
এক লাখ অসসি হজার পীর প্যায়গম্বর কী দুহাই
কইগো বটঠাকরুন আইজ আর পোনা মাছ না পোনার মায়েরে ধইরেছি, হেমেন কই ?
সারাডাদিন চৈতমাসের বাখাল আর দ্যাহো অহনে এই তিলিসমাত ম্যাঘের ভেল্কি আর বাউঘুরনা
মিনসার ফিকর নাই উসসিলার পানিতে বাত রাইন্দা খাওয়ামু বোঝবে অনে গ্যাছে গাছ কাটতে
কী কয়েন !
রাঘব গোঁসাই থানে বে দেছেল বট আর অশথে সেই গাছ
কয়েন কী বৌঠাইন - মাছ তোলেন - আমি দেখি গিয়া ধরি চুদির ভাইরে
সুলেমান প্যায়গম্বর কে চার মুবক্কিল
চার মুবক্কিল চহুঁ দিশি ধাবে
আন্ধার আজৈদহা ফুডিফাডা কুড়ালে কোপও খায় নাই দুই গাছের এক গাছও
হেইহেই ধেইধেই হেইহেইহেই ধেইধেইধেই হেইহেই ধেইধেই ওঃ করালীর সেই কী ঝুমরা
আর গাজি গাজি জোনাক জোনাক কুল্লারির ফলায় জোনাক গাছে ডালে হুই মগডালে কাগশকুনের বাসায়
জোনাক চোখে শ্বাসে জোনাক বুকের মদ্দিখান কাশলে গয়ার উঠে বিজবিজ জোনাক
মেরা ভেজা সওয়া ঘড়ি
পহর সওয়া
দিন সওয়া
মাস সওয়া
সওয়া বরষকো বাওলা ন করে
বাচা চুকে তো উমা শুখে
বাচা ছোড় কুবাচা করে

ধোবি কী নাদ চমার কে কুণ্ডে মে পড়ে
মেরা ভেজা বাওলা ন করে
জন্মনাস্তিক কোনো ইষ্ট দ্যাবতা নাই তবু কইত্থিকা জিবে রাদামাদব রাদামাদব মহামায়া হাসে
মুখে অক্ত অক্কাত উঠি মলো হেমেন
ধুতরার ছোবায় তার শরীলে যহন লোকে হোগাব্বুত উসটা খায় তহন বিষ্টি বারীশ বাহাত্তুরি নাছোড় বরিষণ
তিন রাতের বাসী ভ্যাটকানো মড়া রেইখে ফিরতি আসে পাঁচ মাথা পুঙ্গির পুত জাইল্যা হারান
শিয়ালে খাওয়া হেমেনের শরীলে আজও ঘাও পাঁকুই পাদদরী
কোতলার হোগলায় মউলের রুয়াম বাস ল্যাক ল্যাক হইলদা পুঁইজ চাটে নুনছাল
নথের একখান টিমটিমা রত্তি ঘাসফুল জোনাক মিনসার লুঙি খামচায়া ধরে জিবে কুইন্দা ছ্যাঁকা দেয় যোগিনেরে
ও ভাই ভাতার ফেরো গো নিমবরগদের বান্দা কুয়ায় চুপি ছায়া দ্যাখে নিজির
আর ছায়ারা থুত্থুরি কাপাস মিইশ্যে যায় ম্যাঘের হেকিমী দোয়াতে
ফেরো গো শোনো ওই নাচ শুরু
শব্দ সাঁচা
পিণ্ড কাঁচা
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরোবাচা - -

দীপঙ্করের উপাখ্যানের ঝাঁঝ নেয়া যাক :
‘‘কালীর ঝুমরার তালে চাঁদের এই কুহৈল খিলখিল শ্যাওড়ার জোনাক মিনসা তারার থান ওই
মাতঙ্গীর রেতকালের ভিগা নাটকাপাস পেরোয়ে যেওনি, এ জোনাক ভিরমি হেমেন ঠাকুরতারও ছেলো’’
কে হেমেন ঠাকুরতা ? নিবাস, গয়রহ ? দীপঙ্করের কথায়, ব্যায়ামবীর মাতামহ বঙ্কিমের আখড়া- বন্ধু ঘোর নাস্তিক হেমেন্দ্র গুহঠাকুরতাও বানারীপাড়া নিবাসী ছিলেন। সময়টা ১৯৩০ সালের কাছাকাছি। গ্রামে ছিল জাগ্রত দশমহাবিদ্যার এক মন্দির। তাকে ঘিরে নানা কিংবদন্তি ইতিহাস। দেবী কালী নাকি রাতভর নগ্ন নৃত্য করতেন সহচরীদের সঙ্গে। মধ্য রাত্রে মন্দিরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নূপুর- নিক্কণ ও নারী কন্ঠে সতর্কবাণী শোনা যেত ‘‘ভুলেও তাকাবি না এদিকে, মাথা নিচু করে চলে যা’’। কেউ ভ্রমবশে অথবা কৌতুকে সেদিকে তাকালে তার মৃত্যু হত মুখে রক্ত উঠে। মহামায়ার মন্দির সংলগ্ন দুটি বট ও অশ্বত্থের জোড় ছিল। তান্ত্রিক বিধি অনুসারে বৃক্ষ দুটির বিবাহ দেওয়া হয়। জিদ্দি, অবিশ্বাসী হেমেন্দ্র মন্দিরের পুরোহিত ও গ্রামবাসীদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে গাছ দুটি

কাটেন। এরপরই দেবীর কোপে তাঁর পরিবারের একের পর এক মানুষের অকাল মৃত্যু হতে থাকে। শোকে দুঃখে পাগল হয়ে যান তিনি, তবু পুরোহিতের পরামর্শ অনুসারে মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহের সামনে ক্ষমা চান না। আত্মহত্যার অভিপ্রায়ে একদিন তিনি বাড়ির ছাদে ওঠেন। নিচে ভিড় জমে যায়। বঙ্কিম ও অন্যান্য ব্যায়ামবীররা শক্ত দড়ি ও জুটের শামিয়ানা টানটান করে নিচে দাঁড়িয়ে পরে, কিন্তু সব কিছু এড়িয়ে সকলের চোখের সামনে হেমেন্দ্রর দেহটি শানপাথরের ওপর পড়ে রক্তাক্ত চৌচির হয়ে যায়। এই গল্প দীপঙ্কর শোনে কৈশোরে, যদিও কবিতাটি লেখা হয় অনেক পরে। কবিতার ডিসপার্সাল টেক্সটে এ গল্পকে কোথাওই দানা বাঁধতে দেওয়া হয়নি। তার ভাবনায়- চিন্তনে- চেতনায় সমস্ততম ধারামুক্তির অথৈ উত্থান।

আমি শ্রোতা রবীন্দ্র গুহ, তটস্থ, থ, জড়সড়। লালনের গানের একটা পংক্তি মনে পড়ে গেলো, ''যে জানে উলট- মন্ত্র খাটায়ে সেই তন্ত্র গুরু- রূপ করে নজর বিষ ধরে সাধন করে।'' মনে পড়ে যায় অ্যালেন গীন্সবার্গের ছিন্নমস্তার মূর্তি। এই যে বুকে আঁচড়, আচম্ভা ঝাঁকি - তা কবির স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি - ভূগোল ইতিহাস ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান, কিংবদন্তিতে বিশ্বাস। যা ছিল সুধীন্দ্রনাথ দত্তর, জীবনানন্দ দাশের, অ্যালেন গীন্সবার্গের। বিষয়ের সঙ্গে কবির হৃদয়ের যথার্থ বুননরীতি মানেই নিখুঁত পটুতা - good communication 'থান' অবশ্যই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সরলতাবাদীরা হয়ত 'থান' এর টেক্সটের শুদ্ধতা, সিকোয়েন্স, ভাষাধ্বনি, মন্ত্রমেজাজ, তাৎক্ষণিক পরিবর্তনের দ্রুতি বিষয়ে টেকনিক্যাল প্রশ্ন তুলবেন। উত্তরে বলা যায় কবিতার দর্শন কবিতার ভাষা - - সে ভাষা হৃদয়ের। বাকি সব গৌণ।

রমিত দে
ওই চলা, যা সবখানে থেমে আছে . . .

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত
পোকার মতো

পোকাগুলো ভাম হয়ে, জলের ভেতরে
চলে গেছে।

বৃষ্টি পড়লে, আর

পতঙ্গ- প্রাণীর শ্বাস

শুনতে পাব না;

আমিও পোকার মতো রাগ করে

ঘরে চলে যাব।

“সৌন্দর্য বস্তুটা কি”? এর উত্তরে পিকাসো বলেছিলেন “আমার কাছে শব্দটার কোন মানে নেই, কারণ আমি জানিনা এ শব্দের অর্থ কোথা থেকে এসেছে আর কোথায়ই বা তা নিয়ে যায়।” - সত্যিই তো শব্দের শেকড়- দোঁহা ঠিক কোথায়? ঠিক যেমন কবিতার কথার যে শাড়ি শুকোচ্ছে পাতা জুড়ে সে কোথা থেকে এল কোথায় বা নিয়ে চলল? এ প্রশ্ন যদি আমাদের করা হয় তবে শব্দ নয় বরং শব্দ যা পারে না আমাদের নিজেদের টুকরো করে দিতে হবে তার কাছে। আসলে ওই কথার জন্য বা শব্দের জন্য নয় বরং একজন কবি কবিতা লেখার শেষে কবিতার মধ্যে দিয়ে পাঠকের সাথে যে পূর্নমিলিত হন তা কিন্তু কথার শাড়ির কুচিতে লেগে থাকা কল্পনার কাটাইগুলো জুড়ে জুড়ে, শব্দের সান বাঁধানো উঠোন পেরিয়ে নৈঃশব্দ্যের টুকরোগুলোকে কুড়িয়ে কুড়িয়েই; আর সেই কল্পনার চিত্রনই যখন ক্ষণজীবনের মানুষের প্রতিনিধিকে দীর্ঘকালীন এক খোঁজের মুখোমুখি এনে ফেলে তখনই কবিতা হয়ে ওঠে ভয়াল, পাঠ থেকে পাঠে ফুঁসতে থাকে গাঢ় থেকে গাঢ়তরের খোঁজে। “পোকার মতো” কবিতাটি প্রণবেন্দুর “সদর স্ট্রিটের বারান্দা” কাব্যসংকলনের অর্ন্তভুক্ত, যার অধিকাংশ কবিতাতেই আমরা একজন দ্বান্ধিক কবিকে পরিলক্ষণ করতে পারি যিনি কিনা জীবনের সারাৎসারে ভাঙা কুয়াশার টুকরোগুলো চেনেন অথচ ভবচক্রের শূন্য ঝাঁপিও তাকে পিছু থেকে টানে, ভূঁইপিঁপড়ের মত ফেরার দিকে চলে যেতে শিখেও যিনি কিনা ঘুরে ঘুরে চেয়ে দেখেন থাকার মত মিথ্যে এক চতুষ্কোণের দিকে। অর্থাৎ প্রথম থেকেই আলোচ্য কবিতাটির দুটি দিক অভিনব ও অলৌকিক রীতিতে গাঁথা। একদিকে কিছু আছে অন্যদিকে কিছু নেই। কি আছে? পোকা, জল, বৃষ্টি, ঘর- এই সব ছোটো ছোটো কিছু পার্থিবের সমবায় । জীয়ন্তীর কিছু দীর্ঘায়িত উপমা। আর কি নেই? এই নেইটাই আসলে সদাভ্রাম্যমান এক থাকা, কাব্যের মধ্যেকার শেষ জড়টুকুকে মেরে দিলেই আশ্চর্য্য এক না থাকার চলমান গন্ধ, যা পাঠককে বারবার ওই ছোট্ট কবিতাটির ভেতরে পড়ে থাকা কোনো এক বিপুল আয়তনের নিষেধ ভাঙতে আকৃষ্ট করে। আর এই গভীরতায় তলিয়ে গেলেই একটি লক্ষীমন্ত কবিতা ভাঙতে থাকে, উঠে আসে রিক্ততার এক গূঢ় অন্তর্লোক, উঠে আসে এক বন্দী মানুষ, অস্তিত্ব সম্পর্কে যে সত্রস্ত সন্ত্রস্ত অথচ অসহায়, সেখানে সে চড়ুইভাতির মত পত্রালী সাজিয়ে বসেছে হারিয়ে যাবে জেনেও।

“পোকার মতো” কবিতাটি অস্তিত্বের অনুরনণকেই নতুন করে সঞ্জীবিত করে দেয়। কিন্তু কি ভাবে? অস্তিবাদ নিয়ে হাজারো স্তরস্তরান্তর, যার মধ্যে আরম্ভবাদ থেকে শুরু করে পরিণামবাদ নিয়তিবাদ বিবর্তবাদ কি নেই আর যেকোনো শিল্পের ইথারবিশ্বে এই সেই অনিঃশেষ সম্ভাবনাজাত এক অসমাপ্তি, যা শিল্পীর হাতে এসে হয়ে পড়ে মায়াবাদ। প্রাত্যহিক থেকে পথে নামার, বস্তু থেকে কল্পে ওড়ার প্রতিমুর্হুতে এই মায়াবাদই কিন্তু আমাদের কবিরও প্রধান আশ্রয়, অসহায়তাও বটে। একজন কবি তিনি কিন্তু জানেন অস্তির অলীকতা, জানেন তা স্থায়ী নয় আর তার প্রকৃত স্বরূপে ফেরার তাড়নায় বারবার ঘরে ফেরার কথা বলেন, পথের হদিশ খোঁজেন। যাপনের জড় অক্ষরগুলোর মাঝে বুঝতে পারেন শেকড় আরও গভীরে এবং শেষমেশ শূন্যে, জৈব সমগ্রতা শেষমেশ কেবল এক জায়মান শূন্যেই- সচেতনভাবে সেটাই তার অতিচেতনার জিনিস, যার জন্য সৃষ্টির সমগ্রতায় রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অমিয় চক্রবর্ত্তী প্রায় সবাইকেই আমরা উচ্চারণ করতে শুনি একটিই মাত্র অশেষ আর্তি ; সাহিত্যের শতকৌণিক অংশ প্রত্যাংশে অন্বেষিত একটিই ধ্রুব পংক্তি- “পথের শেষ কোথায়! কি আছে শেষে ! ”- অর্থাৎ একজন কবি তাঁর আয়ুষ্কাল অবধি নিজস্ব পারমার্থিক পরিসীমার ভেতরেই যুগপত খুঁজে চলেছেন একধরনের অনিঃশেষ পর্যটনের স্নেহচ্ছায়া। কেবল কবিগুরুই নয়, রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতায় যে অমিয় চক্রবর্ত্তী তাঁর মধ্য কবিজীবনে লিখলেন - “গাছ চাই, গাছ হবে, ছায়া দেবে, বাড়ীতে বাগানে/ শহরে শিল্পের সৌধে প্রাণ জাগে প্রাণে” সেই কবিই শেষ জীবনে আত্মসমর্পণ করতে চাইলেন পরিত্যাগের মন্ত্রে। লিখলেন- “নিজেকে জড়িয়ে থাকা শিল্পীর পক্ষে শাস্তি; ছড়িয়ে যাওয়া ছাড়িয়ে চলাই তার ধর্ম। মাঠের পথে, জাহাজে নৌকার ঘাটে, প্লেনের উচ্চ হাওয়ায় ঘুরেছি, বাড়ি ফিরেছি। আজ বেলাশেষে সেই পরিক্রমা একটি মাত্র মৃৎরেখায় পরিণত । ওপরে আকাশ, পাশে দিগন্ত। মাটি, ধরণি, বসুন্ধরা যে নামেই হোক, ভূমিস্পর্শ অভিযানই আমার স্বপ্রকাশ, তার অন্য ভাষা নেই, ভাষ্য নেই”- স্বাভাবিকভাবেই কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতালোচনায় রবি ঠাকুরের বা অমিয় চক্রবর্ত্তীর প্রসংগ উত্থাপনের যুক্তিযুক্ততা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। আসলে যে পথের কথা রবি ঠাকুর বিশ্বপ্রকৃতির ভরল হৃদয়তলে খুঁজলেন কিংবা যে বাড়ি ফেরার কথা বললেন অমিয় চক্রবর্ত্তী, ধূলোমাটির প্রতপ্ত পৃথিবী ছেড়ে ঠিক তেমনই কোনো এক আর্দ্র অলক্ষ্যের ভূমি ও ভূমায় ফেরার সমর্থনই কি মিলল না প্রণবেন্দুর “পোকার মতো” কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে? বিশেষ করে “ঘরে চলে যাব” র মত শব্দগুচ্ছ অস্তিত্বের প্রকাশময় স্বরূপ ছিঁড়ে প্রজ্ঞানের গাঢ় অপ্রকাশিত ভাষাকেই ছুঁয়ে যায়। এই যে ‘ঘর’ এই যে ‘জল’, এ কি বস্তুনির্ভর ব্যক্তিনির্ভর কোলাহলের প্রদোষচ্ছায়া থেকে নৈর্ব্যক্তিক স্থিরতার ধ্রুব আশ্রয়ের খোঁজ! কল্পনার আকাশটা যে আশ্চর্য্য দোহাট করে খোলা, সংরক্ষণহীন, আর তার ফলে কবির অণুতে তনুতে এক সদাভ্রাম্যমান আবহ। যা তাকে ঘোরায় ওড়ায় স্মৃতি ও শ্রুতির সংগৃহীত ফলগুলির আশেপাশে এবং পর্বে পর্বে এই প্রাণের আশ্রয়ই প্রজ্ঞানের রূপ ধারণ করে। শেকড়সন্ধানী কবি তখন নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে থাকেন যাপনের এত সব দ্বন্দ্বযুদ্ধ থেকে। তিনি ফিরতে চান; অজান্তেই নিজেকে ডেকে ওঠেন; জল- স্থল- অন্তরীক্ষের টানটান আস্তিক্য থেকে। তার তখন ছুটি নেওয়ার প্রস্তুতি, ভাড়াবাড়ি ছাড়ার প্রস্তুতি।

কিন্তু প্রণবেন্দুর কবিতাটিকে এখানেই আমরা শেষ বলতে পারিনা। শেষ পর্যন্ত এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন থেকে যায় কবিতাটিকে জড়িয়ে, তা অন্তর্লীন, তা গোপন, অথচ দীক্ষিত পাঠকের কাছে তা গুঞ্জরণময়, চেতনাকে সহজেই গ্রাস করে তা হয়ে ওঠে আবহমান। এখানে একজন বিমূঢ় মানবসত্তা কবি স্বয়ং, তিনি অস্তিত্বের অন্তহীনতায় এসেও বেঁচে থাকার প্রশ্নমালা খুলে দিচ্ছেন পাঠকের জন্য। আসলে অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বের পারস্পরিক দুর্মর টানাপোড়েনের কবিতা ‘‘পোকাদের মতো’’। জীবনের মহাপট থেকে যে পরিবর্জণের পথ খুঁজলেন কবি সে প্রসবপৃথিবীর নাড়ী কাটা কি এতই সহজ? তাঁর অন্ন জল আলো বাতাস ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা কি এতই সহজ? প্রণবেন্দুর ‘‘পোকার মতো’’ কবিতায় সর্বতোভাবে ফুটে উঠেছে এই অসহায়তাই। একদিকে দর্শন অন্যদিকে দৃষ্টি- কবিতাটিকে বিশ্লেষণের একটি সমান্তরাল প্রেক্ষাপট তাই তৈরী করে নিতে হয় আমাদের। আর কবিতার মধ্য কবিও তৈরী করে নেন তাঁর নিজস্ব দুটি নোশন - একদিকে স্পেসিস নোশন, অন্যদিকে সেলফ নোশন। একদিকে বহমানতা, তো অন্যদিকে প্রবহমানতা। এখন কবিতার কাঁধের ঝোলা থেকে আমরা পংক্তিগুলিকে নামিয়ে আনি কবির কমিটমেন্টের কাছাকাছি । কি দেখলেন প্রণবেন্দু? জলের ধারে দাঁড়িয়ে দেখলেন কয়েকটি পার্থিব পোকা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল স্থির প্রাচীন জলীয় অন্ধকারে! কিন্তু সত্যিই কি দেখলেন তিনি? মৃত্যুর অনিবার্যতা। নাকি টলমল করে উঠল তাঁর নিজেরই একা নিঃসঙ্গ আমিটা, যে কিনা জন্ম রহস্যের লীলায়নে দাঁড়িয়ে ততক্ষণে বুঝে গেছে মানুষের জীবনও আসলে আদ্যন্ত জলপ্রবাহ। ভেসে যেতে হবে ছেড়ে যেতে হবে কবিকেও। ফিরে যেতে হবে অব্যক্তের অন্ধকারে। অথচ একজন কবির কাছে একজন দ্রষ্টার কাছে একজন চেতনাশীল প্রতিনিধির কাছে এই ফেরা তো আলোর ইশারা, তবে কেন প্রণবেন্দুর উচ্চারণে লেগে রইল ‘‘রাগ করে’’ চলে যাওয়ার মত একটি আধোজাগা অভিমান? আর এই প্রশ্নটাই কবিতাটির ‘প্রান্তিক দিব্যতা’। হ্যাঁ, এ কেবল আত্মবিশ্লেষণের কবিতা নয়, এ যেন অভিমানের কবিতাও। এখানে কবিকে যতটা না ব্যক্তিগত নিভৃতির মহনীয় দৃষ্টিতে দেখা যেতে পারে তার চেয়েও যেন একজন কবি যিনি জারিত তাঁরই চারপাশের আনন্দ আস্তিক্যে। যে ক্ষণজীবনের দরজা খুলতে খুলতে বেরিয়ে যাওয়া সেখানেই কবির পা আঁকড়ে ধরছে জীবনের বিচিত্রতা, অথচ পেরোতে তাকে হবেই, এই প্রাণময়তা থেকে রিক্ত ও নিঃস্ব হতে তাকে হবেই। ইহবিশ্ব থেকে ইথারবিশ্বে চেতনার পরিক্রমণে এই যে দ্বন্ধ এই যে টানাপোড়েন তাই যেন কবিতাটির সূত্রভাষ্য হয়ে ওঠে। এ প্রজ্ঞানের সাথে ইন্দ্রিয়ের সংঘাত। পাঠকের মনেও তাই বারবার প্রশ্ন উঠতে থাকে কোনখানে আঁটবে কবি- অবয়ব থেকে আলো - বাহিরে ভেতরে সর্ব্যত্রই ব্যপ্ত যে তিনি। একজন চিরকালের স্রষ্টার কাব্যপরিক্রমাতেও তাই তো ক্ষণকালের লুকোচুরি। আসলে যে ইমমর্টালিটির দিকে নিজেকে ক্রমশ নিঃস্ব করতে থাকেন কবি, যে আধ্যাত্মিক শূন্যতার সামনে দোহাট করেন নিজেকে সেখানেও ইন্দ্রিয়গত বন্ধনের প্রতি ফিরে তাকাবার দাবী ওঠে। এই সেই সমাজমানসতা যা থেকে একজন কবিও হয়ত চেয়েও সম্পূর্ণ ছাড়া পেতে পারেন না।প্রণবেন্দু নিজেও তো বলতেন - ‘‘কবিতা কখনোই সর্বতোভাবে সমাজ- বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা। ’’ আর ‘‘সদর স্ট্রীটের বারান্দা’’ কাব্যসংকলনের বেশীরভাগ কবিতাতে তিনি কবিতার ভাষাকে মুখের ভাষার সাথে মিলিয়ে দেওয়ার কাছাকাছি রাখার যে অনুসন্ধান করেছিলেন তাও যেন সার্বিকভাবে নানাস্তরে গেরুয়া সূর্যাস্তের নিচে দৃশ্যমান পৃথিবী কামড়ে পড়ে থাকার কথাই বলে।

কবিতাটির সাধারণ শব্দের মধ্যে কবি মিশিয়ে দিয়েছেন কিছু অসাধারণ সম্মোহ। কিছু আধৃত বাক্যাংশ বা ম্যাট্রিক্স ক্লজ নিয়ে আলোচনা করলেই তা টের পাওয়া যায়। যেমন ‘‘আমিও পোকার মত’’ বা ‘‘পোকাগুলো ভাম হয়ে’’ বাক্যাংশে মূল অংশকে বিশেষিত করার জন্য কবি যে অ্যাট্রিবিউট বা গুণবাচক অংশ যোগ করেছেন তা থেকে অস্তিত্বের উদ্ভট লুকোচুরিটিই আরও প্রতীকি হয়ে ওঠে। ‘পোকা’ রূপকের আশ্রয়ে মানব অস্তিত্বের দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত খসড়াই ধরা আছে কবিতাটিতে, যেখানে জন্মের জীবনের এত চিৎকারের মাঝেও সে একাকী, নিঃসঙ্গ, স্থবির মৃত্যুর মত কেবল এক ছায়ার শরীর। পোকা নামের আধৃত বাক্যাংশের মধ্যে আসলে প্রতিস্থাপিত হয়ে রয়েছে যাপনের ট্র্যাজিক ন্যারেটিভ। পাশাপাশি ‘‘ভাম’’ শব্দটির মধ্যে দিয়েও কবি স্থাপন করতে চাইলেন স্থির নিঃসঙ্গতার সজীব চিত্রকল্পটি । প্রণবেন্দু জলের আগে ভাম শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন বিশেষণরূপে যা যাওয়াটিকে আরও ঘন করে তুলেছে, ঘনত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে কোনো এক অনিকেত ভ্রমণের। কিন্তু অনিকেত কেন? কেন আমাদের প্রথম লাইনটি পড়বার পরই মনে হতে থাকে হারিয়ে গেল, ওই তো হারিয়ে গেল, যা ছিল শ্রুতিসুখকর স্পর্শসুখকর হয়ে, তা হারিয়ে গেল শূন্যের ব্যঞ্জনায়! আসলে অনেকটা অল্পপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণে হাওয়ার পরিমান বাড়িয়ে আমরা যেমন মহাপ্রাণ বর্ণ তৈরী করে থাকি যা পূর্বোক্ত বর্ণের তুলনায় অধিকতর গমগমে গম্ভীর এবং জমজমে, ঠিক তেমনি জলের বর্ণনা এনে একটি গভীরতার জন্ম দিয়েছেন প্রণবেন্দু যা ‘ভাম’ শব্দের গাম্ভীর্যকে অধিকতর আয়তন প্রদান করে প্রথম পংক্তিতে একধরনের বিরহী দৃশ্যকল্পের সামনে দাঁড় করিয়েছে পাঠককে। দ্বিতীয় পংক্তিতে এই দৃশ্যকল্পই হয়ে উঠেছে পাঠকের আত্মপ্রশ্ন। কবি সরাসরি তাঁর শাশ্বত অস্তিত্বকে মিলিয়ে নিয়েছেন গোধূলিবেলার গন্ধের সাথে, মিলিয়ে নিয়েছেন থাকার ভেতর হারিয়ে যাওয়ার নিয়তিনির্দিষ্ট সমীকরণের সাথে। আর পাঠক? এখান থেকেই পাঠক মন খারাপ করতে শিখে যাচ্ছে। চেপে ধরছে তার চারদিক। এ এক জটিল নির্মাণ। এ এক নিবিড় বিপন্নতা। নিজের স্বরের মধ্যেই নতুন প্রস্বর খুঁজে ফিরছে পাঠক। সে প্রস্বর এই গুনগুনিয়ে ওঠা জীবনের সামনে ভীষণ একাকী। এখানেই ওই পোকার সাথেই ঠোকাঠুকি হয়ে গেল পাঠকের ! আর কবি জল শব্দের ‘ল’ এর দীর্ঘ অনুপ্রাসে ঢেকে দিতে চাইলেন পোকার মত কিছু ব্যর্থ জীবন . . .

কবিতার রাজ্যে ‘জল’ শব্দটার নজির কিন্তু দুর্লভ নয়, হয়ত একধরনের চিরপ্রবাহমানতার নিগূঢ় আস্বাদকেই কবিরা তাদের ভাষাচিত্রের মাঝে খুঁজে পেতে বারবার জলের কাছে ফিরে আসেন, তার উঁচু নীচু ডাঙায় খুঁজে ফেরেন একধরনের অজ্ঞাতকুলশীল ভ্রাম্যমানতা। তাই জলকে ঘিরে তার পাঠের তার প্রজ্ঞাদৃষ্টির তার পরিচয় অপরিচয়ের প্রস্তরও বিরাট। একজন কথকের দেখা আবহমান ও অদেখা আশ্চর্য অনিঃশেষকে তাই বারবার আমরা বিবিধ রূপে এই জলেরই সানন্দ স্বীকৃতি পেতে দেখি। প্রণবেন্দুর উল্লেখিত কবিতাতে আমরা ‘জল’ শব্দটিকে কালির আকরে একবার প্রত্যক্ষ করলেও কল্পনার কোষাগারে ঢুকলেই দেখতে পাচ্ছি জল সেখানে বিবিধ বিবৃতি হয়ে গেছে। প্রথম লাইনের পোকাদের জলে চলে যাওয়া আর শেষ লাইনে কবির নিজের রাগ করে ঘরে চলে যাওয়া পংক্তিদুটির মাঝে একধরনের সুপ্ত রুবাই, একধরনের রক্তচলাচলের যে যোগ রয়েছে তা স্পষ্ট। কোথাও কি প্রণবেন্দু ওই ‘জল’কেই নিজের প্রস্থানভূমি বললেন না ? নিজের ঘর?

নিজের বিজন আবাস? না, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই এব্যাপারে। কিন্তু ভৌত জল না বরং তার আকারে তার তরঙ্গতায় পড়ে থাকা প্রত্যুত্তরহীন গভীরতার সংলাপকে, শূন্যতার নিরাবিল দৃষ্টিকেই প্রণবেন্দু যেন সূচক করে তুললেন ফেরার মহত সম্পূর্ণতার ছবি আঁকতে।

ছবি প্রসঙ্গে নন্দলাল বসু একবার বলেছিলেন- "শান্তরস সব রসের গোড়ায় আর শেষে। দুঃখ হোক আর সুখ হোক, প্রেম ঘৃণা আবেগ উত্তেজনা যাই হোক না কেন, তখনই তা আর্টের বিষয় হল যখন তার অন্তরালে তার ঊর্ধ্বে একটা স্থিতি একটা শমতা (poise) একটা নৈর্ব্যক্তিক সমভাব রইল"- আলোচ্য কবিতায় 'জল' ও যেন সেই সমভাব, অস্তির কুচো কুড়োতে কুড়োতে যার কাছে এসে কবি শিখে নিলেন কবিতা লেখার কৌশল ।

নিজেরই অপর কবিতার শিরোনাম 'কবিতা লেখবার জন্য' দিলেও প্রণবেন্দু জানতেন কবিতা কেবল লেখবার জন্য নয় বরং দেখবার জন্য আর একজন দীক্ষিত কবি দেখার মধ্যেই খুঁজে নেন ভাষার মুক্তি। এই ভাষার, অক্ষরের মধ্যেই তাই পড়ে রয়েছে দেখার ইনডায়রেক্ট ন্যারেশন। সেখানে জল কেবল জল নয় বরং তার ঘনতা তার একাকীত্ব তার ভেতরকার গভীরতার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে থীতু হওয়ার একটা জায়গা – আর সেই তো কবির কাম্য, বুদবুদকল্প যাপনীয় মায়াবাদ ছেড়ে অনন্তে মিশে যাওয়ার মত উর্ধ্বপরিণামের সার্থকতাই তো কবি খুঁজে ফেরেন আজন্ম। সীমাকে অতিক্রম করাই তো একজন প্রকৃত কবিতার প্রাথমিক আত্মজিজ্ঞাসা। তাই কবিতাটির ক্ষণকালের খেয়াঘাটগুলি পেরোলেই আমরা পেয়ে যাই ভাববীজের কিছু ভাসমানতা, যেখানে শৈল্পিক বাস্তবতাগুলোকে শিল্পী সৃষ্টির গভীর সম্প্রসারণের সাথে যুক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, বরং এখানেই সেই কাব্যিক মোচড়, এখানেই সেই বোধের নিপুনত্ব, যা উজানের দিকে যেতে যেতেও চাওয়ার আর্তিগুলোকে চিহ্নিত করে যাচ্ছে আশ্চর্য সূক্ষ্মতায়। যে উৎসের দিকে যাত্রা স্বাভাবিক, যে উৎসের দিকে টলমল করছে এই মিথ্যে থাকা, সেই উৎসের দিকেই পা বাড়াতে গিয়েও একধরনে নিরুত্তর পিপাসার থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছেন না কবি । শেকড়চ্যুতির অসহায়তা তাঁকে নৈর্ব্যক্তিক অন্তিমতা ছুঁতে দিচ্ছেনা কোথাও যেন। আরও বলা ভাল আস্তিকের আত্মীয়তা থেকে যেন পরিত্রাণ চাইছেন না তিনি। সত্তা ও শূন্যের মধ্যবর্তী গভীর কুয়াশা সরিয়ে দেখতে এসে একটি মানুষের নিজেরই যাপনের সেরেস্তায় অনন্তের সাথে অসীমতার সাথে অস্তির এ সেই চিরকালীন কথাজিজ্ঞাসা। তবে কি জীবনকে দখল করার মাঝেই তাঁর উৎসর্জন? তবে কি প্রণবেন্দু বোঝাতে চাইলেন অস্তিত্বের অর্থহীনতার চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান একটি প্রবাহের প্রতি মানুষের অনন্ত প্রতীক্ষা? প্রণবেন্দু কবিতায় কোথাও লেখেননি তিনি সীমা অতিক্রম করতে চাননা বরং শেষ লাইনে আমরা পাচ্ছি সরাসরি "ঘরে চলে যাব" র মত ইতিমূলক বাক্য। কিন্তু সত্যিই কি স্বেচ্ছায় ফিরে যাবেন তিনি? তবে রাগ করবেন কেন? কিসের জন্য? কার ওপর? এখানেই বাক্যটির মধ্যবর্তী শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্কে একধরনের আপেক্ষিকতা লক্ষ্য করতে পারি আমরা। বাক্যের এক্সোসেন্ট্রিক কনস্ট্রাকশনে যেমন একটা যাওয়া আছে, একটা ফেরা আছে, তেমনি এন্ডোসেন্ট্রিক কনস্ট্রাকশনে আমরা লক্ষ্য করতে পারি একধরনের না যাওয়ার আকূতি, না ফেরার আবদার। ফলে বাক্যটিকে এবং সাথে সাথে সামগ্রিক কবিতাটিকে প্রণবেন্দু কোন পূর্ণতার পাঠ দেননি, বরং পাঠককে পাজলগেমের মুখোমুখি করে গেছেন, পিপাসা দিয়ে গেছেন মেলাবার, না- মেলা পূর্ণতার সন্ধানী করে গেছেন।

কবিতা যেমন একদিকে কথা বলে এবং কথা বলতে বলতেই নীরবতায় চলে যায়, সাদা হয়ে ওঠে কথাবলা হালকা নীল বর্ণমালাগুলো ঠিক তেমনি ‘‘পোকার মতো’’ কবিতাটির ভাষিক চিহ্নগুলোর মধ্যেই সুঠামভাবে প্রতিস্থাপিত করা রয়েছে কিছু নীরবতায় থীতু হওয়া অচিহ্ন। যে জল দিয়ে শুরু হয়েছে কবিতার আবহ সেই জলই কোথাও বাড়তে বাড়তে খেয়ে নিয়েছে তার চারিধারের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আস্তিক্যের পাড়বাঁধানো সেরাস্তা; কবিও একলা বেড়াতে শিখতে শুরু করছেন ঠিক এখান থেকেই অথচ এই একলায় কেবল পবিত্র শূন্যতার অঙ্গীকার নয় বরং একজাতীয় না- থাকার নৈঃশব্দ্য- মথিত আর্তনাদও যেন শব্দের মধ্যবর্তী ফাঁকফোঁকরগুলোতে নাটকীয় দরজির কাজ করেছে। সত্যিই তো একজন কবির কাম্য কি? কেবল প্রত্যাবর্তণ? কেবল সমর্পণ? তিনি কি কেবল চরমপন্থী বিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাসী হবেন? নাকি তারও থাকবে এই বাগান এই চরাচর এই সুশীল থাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার অভিমান? ঠিক এই প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে যায় প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের ‘‘পোকার মতো’’ কবিতাটি। বারবার প্রশ্ন তোলে এই যে এত বড় জীবন আর এই যে তার চারধারে এত বড় উৎসবপ্রাঙ্গণ সে ছেড়ে কবি কোথায় যাবেন? কোথায় যাবে সঙ্গ নিঃসঙ্গতার মানুষ? কোথায় যাবে তুচ্ছ খুশির মত খুশবুদার যাপনগুলো?

১৮৯৩ এর ডিসেম্বরের এক বিকেলে রবীন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে যেমন লিখেছিলেন- ‘‘নিত্য এবং অনিত্য নামক দুটি অসীম বিরোধের ঠিক মাঝখানে বাস করি আমরা। যদিও তারা চিরসংলগ্ন চিরপ্রতিবেশী তবু পরস্পরের কাছে পরস্পর এমনি হাস্যজনক’’- ঠিক তেমনি নিত্য এবং অনিত্যের সীমানা জরিপের সামনেই পাঠককে দাঁড় করিয়ে দিলেন প্রণবেন্দু। কবিতার কথা ফুরিয়ে গিয়ে কবিতা হয়ে উঠল ধোঁয়াটে এবং এই দ্বন্ধ এই নিজেকে খুঁজতে বেরিয়েও না খুঁজে পাওয়ার মত কিছু পরস্পরবিরোধী ন্যারেশনেই কবিতাটি হয়ে উঠল অভিনব। ‘‘পোকার মতো’’ কবিতাটির মধ্যে রয়েছে কিছু আত্মিক বিতর্ক, কিছু হিডেন প্যারামিটার। প্রাথমিকভাবে কিছু পোকা নিয়ে কবিতাটি শুরু হলেও পুরো কবিতার শেষে এসে এই পোকার সংজ্ঞাই যেন পাঠকের কাছে একধরনের আবহমান পর্যবেক্ষণ হয়ে ওঠে। একটি অজ্ঞাত নির্বাসনভূমির দিকে যাপনের ক্রম অগ্রসরনের মধ্যে দিয়ে পংক্তিগুলির খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে পেকে ওঠে জীবন নামের একটি অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদের বেদনা। বারবার জানতে ইচ্ছে করে প্রথম লাইনে যে পোকাদের জল দিয়ে ঢেকে দিলেন প্রণবেন্দু তা কি যাপনেরই এক বিভ্রম? কোথায় গেল তারা? কবির সাথে সাথে আমরা পাঠকেরাও তো তাই জলের উপর ঝুঁকে পড়ি স্রেফ ওই যাওয়াটুকু দেখবার তাড়ণায়।

(নিবন্ধটির নামকরণের জন্য কবি আলোক সরকারের কাছে লেখকের ঋণ রইলো)

↑ পরের পৃষ্ঠায় যাওয়ার জন্য ওপরে "কাব্যসাহিব" মেনুতে ক্লিক করুন

ওগো জ্যান্তে মরা, তা কি পারবি তোরা সে প্রেম- সাধনে

I hope she has her cow. Bidding a wedding, widening কাব্যসাহিব received treading, little leading mention nothing.

তৈমুর খান

বাংলায় অ্যান্টি কবিতার নতুন ধারা

‘কবিতা ক্যাম্পাস’ অপর কবিতার ভুবন থেকে প্রকাশিত কবি দেবযানী বসুর (জন্ম ১৯৬০) পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ ‘নোনামিঠে জলচিহ্ন’ প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২, সম্প্রতি আমার হাতে এসে পৌঁছেছে । দেবযানী বসুর কবিতা ইতিপূর্বে আমার তেমন ভাবে পড়া হয়ে ওঠেনি, মূলত কলকাতা থেকে বহুদূরে অবস্থান করার কারণেই । এই বইটা পেয়ে একটা উপলব্ধি হয়েছে । এই কবি বাংলা কবিতাকে এক ভিন্নতর গ্রহে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। চিরাচরিত কিম্বা সনাতন বাংলা কবিতার পাঠকের কাছে এই কাব্যের কবিতাগুলি পাঠের যোগ্যতা হারাবে। যে ছন্দ, বাক্য ও ব্যাকরণবোধে সাধারণ পাঠক দীক্ষিত, এই গ্রন্থের কবিতায় তা নেই। সুর মাধুর্যের কোনো রিদমই খুঁজে পাবে না। কবিতা যে এরকম হতে পারে তা তাদের ধারণারও বাইরে। কিন্তু এই কবিতাগুলির যে একটা জগত আছে, সদর্থক বিভঙ্গ প্রাচুর্য আছে, এবং শব্দার্থের নতুনতর ভারবালাইজেসন আছে, তা না দেখলে বোঝা মুস্কিল।

দেবযানী সস্তা জনপ্রিয় কবিতা লেখেন নি । তার কবিতাকে তিনি কখনই আম জনতার প্ল্যাটফর্ম করে তোলেন নি । চটুল বিবৃতি আর ছন্দের ভিত তার কবিতায় নেই । মগ্নপাঠকের একান্ত অভিনিবেশ থাকলে একে একে তার কবিতার পোশাক খোলা যায় । তার কবিতার ভাবসমূহের ভাঙা সাম্রাজ্যে অ্যান্টি পোয়েমসের লক্ষণ দেখতে পাই । কার্যত কবি সেলফ মুভিং এর পথ ধরেই সেলফ অপিনিওনেটেড এ পৌঁছেছেন । আত্মপ্রত্যয় এমনই পর্যায়ে যেতে পেরেছে যে কাব্যের সর্বত্রই কবিকে সেলফ লুমিনাস হিসেবে পেয়েছি । সাহসী পদক্ষেপ বলেই ইমেজগুলিও অ্যান্টি ইমেজে পরিণত হতে পেরেছে । বস্তুতান্ত্রিক বোধের জগতে অবস্তুর অবিরাম সংকেত সজাগ হয়ে উঠেছে । এক বৃহৎ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণের আড়মোড়া ভাঙা ব্যাপ্তি আমাদের সচকিত করে । তথাকথিত বিশেষণ যেমন কবি ব্যবহার করেন না, তেমনি একমুখী বিষয়েও মুখ ফেরান না । সংশয়বাচক শব্দের অথবা অব্যয়েরও প্রয়োগ ঘটান না । জলপাই ও জায়ফল তেল বাংলা সিরিয়ালে পা ছড়িয়ে বসে , আবহাওয়া বসতি গড়ছে যখন কারখানাগুলি চঞ্চল , সর্দিলাগা এস এম এস শৈত্য তেহা নেহা , তানপুরায় ছায়াদোলানো রোদ্দুর এসব যেমন পাঠককে নতুন দৃষ্টি দেয়, তেমনি সম্পক্ব ও সম্পর্কের দূরত্ব নির্ণয়ে মেধাবী করে তোলে। জাগতিক

বিস্ময়ের ভিতর আমাদের এত সংরাগ, এত বিপন্নতা, এত উত্থানপতন এবং তীব্রতর পীড়ণের স্খলন তা এইসব কবিতার কাছে বুঝতে পারি । কবি লেখেন □

জানলা ছোঁয়া ট্রেন সংকেত উড়িয়ে দিল
ট্রেন গুমটিতে সেই চাদ্দিক খোলা মঞ্চ
গ্লাসের মধ্যে জারানো মুণ্ডুটির সংলাপ
মাইকেল পুতুলের অনড় হাসি খালিপেট
টিং টিং বাজা সাইকেল, পর্দার উৎকট
উঁকিমারা ঘরে খেলছে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে
বাস্তবতা নগ্ন দেহ ছেড়ে ক্যানভাসে উঠে
আসছে□□।

অথবা

সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি ক্যালরিমাপা প্রসাদ
পেটে জেলুসইলিক শান্তি এনেছে লিপস্টিক লাগা ধোঁকলা□□

অথবা

হাওয়ায় বিজবিজে ভক্তি
কিউবিক কিউবিক শ্বাসদম□□

আমাদের কাছে এই অ্যান্টি মুভিং ইমেজগুলি কত তীব্র প্রাণীবিদ্যার সামীপ্য এনে দিয়েছে এবং প্রবৃত্তির ঝাঁকুনিতে ভিন্নতর আবেশে নিমগ্ন করেছে তা বিশ্লেষণ করা যায় না। কবির ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল- কোষকলাকোয়া মাইক্রোচোখ, হুড়হুড়ে হাওয়া, শর্টসার্কিট, জোলাপিক, প্লাস্টিক শাপলাদিঘি, কলোর্মিহাস্য, জেলুসইলিক, ধোঁকলা, বিজবিজে ভক্তি, কিউবিক কিউবিক শ্বাস দম, দশগজী পাগড়িরা, প্রেমায়াম স্তনিলা, টেন প্লাস মুসাম্বি পিলিং, নীল কিউ, রোমশ সাম্পান, রূপস্না, ক্লিকানি ককানি, আলেয়ান্ত পুং শব্দ,

মনোক্রোমিয়াম, ইন্ডিয়া ইঙ্ক, দশপরশ প্রভৃতি । শব্দগুলি শুধু অর্থবোধের বাচ্যার্থ নিয়ে আসেনি ; ইংরেজি শব্দ, অপ্রচলিত শব্দ, ব্যাকরণ অস্বীকার করেই ব্যবহৃত হয়েছে । কবি স্বয়ং মননের প্রদীপ্ত উদ্ভাসে একটা ঐতিহাসিক পটভূমিতে জাতির মেরুদণ্ডের সংযমী দীর্ঘশ্বাসকেও কম্পিত করেছেন । ইংরেজি, হিন্দি, দেশি অপ্রচলিত শব্দ পাশাপাশি কবি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন । এডীথ গ্রসাম কৃত অ্যান্টি পোয়েমসের ভাষা ও শব্দশৈলী সম্পর্কে উল্লেখ্য কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে হল - ''language that is not emotively congruous with the subject matter is a basic component of the structure of anti-poetry. The ironic effect of prosaic language in the context underscores the differing points of view of the poem's protagonist and the reader who observes him emphasizes disparities between the tone of the work and its intention and the imagery, the figures, the serious, comic, ordinary feeling of the language in a poem''.

দেবযানী বসু এরকমই গদ্যময় প্রায় কর্কশ একধরনের ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং যা শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বাভাবিক বোধের ভেতরই ফিরে এসেছে। অ্যান্টি পোয়েমসের যাবতীয় লক্ষণের মধ্যে তার কবিতা নিজস্বতা খুঁজতে চেয়েছে বলেই শব্দ ব্যবহারেও এস্ফাসাইজের ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। শব্দকে ইচ্ছেমত বিনির্মাণে খাড়া করেছেন । কবি যখন লেখেন চেতাবনি ঝুলতে থাকে । লিঙ্গ ঘুমিয়ে বহুকাল । তখন চেতাবনির ব্যবহারে কবিকে চেনা যায়; লিঙ্গ সৃষ্টি সমন্বিত প্রায়োগিক এক ধারণার সঞ্জাত প্রতীক বা অঙ্গ যা থেকে ধর্মীয় স্তরের প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন । আবার হিজড়ে রোদ ফিরে আসে কথাটিতে পাই আদিম আদমের প্রসঙ্গ, যা পুরুষকেই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে । কবিতাগুলিতে মিরর পোয়েট্রিরও লক্ষণ ফুটে ওঠে । কিন্তু অ্যান্টি পোয়েট্রি ও মিরর পোয়েট্রি দুইই একে অপরের পরিপূরক । এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন নিকানোর পাররা - ''antipoetry mirrorpoetry, not as its adversary but its perfect complement..... it is as opposite, complete, and interdependant as the shape left behind in the fabric where the garment has been cut out''. এই খেলাতেই দেবযানী বসু প্রকৃতি এবং পুরুষকে নারী ও বোধের প্রত্নবিশ্বাসে রচিত করেন। আরএকটি কবিতায় তিনি লেখেন –

''একপশলা দুপুর মঞ্জরিত অলোক এই লোকে
এবং কড়িলাগা আয়নায় নির্জনতাশৈলী কুচি... কুচি. . .
না চাওয়া মেঘে গল্পনা দিতে দিতে
হাতে জল মাখি

তখন সহজেই বোঝা যায় কবির বোধ ও দৃষ্টির ছায়া সমন্বয় কতোখানি মিরর ও অ্যান্টি পোয়েট্রিকে মিলিয়ে দিয়েছে । এই বুননটিও তখন মনে হবে দি ফেব্রিক হোয়ার দি গারমেন্ট হ্যাজ বিন কাট আউট । কাব্যের বেশ কিছু পঙক্তিতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বারবার ফিরে আসে। শব্দ

ও ইমেজে এই ভাবেই একটা সমন্বয় চলতে থাকে। তারি কয়েকটা উদাহরণ

১। হ্যাজাক আলোর এখনও শিং গজায় নি । শুকনো ঘাসে তারা সবুজ আলো ফেলছে ।
২। গানে গানে কম্বলবুক গাঢ় সজীবতায় ডুবেছে
লোকপ্রিয় সাদাচুল উড়ছে মুখ ঘিরে, লু লাগা বাউল
৩। জোব্বা পরা হাট ভাঙবার আগে উটেরা সময় পায় নিজস্ব পরব পালনের,
মানুষের ক্যারাভান ভাণায়, বানায়
৪। মন্থর প্যাগোডার মন থরথরানো ড্রামের সকাল
৫। বৃষ্টি ঘরের ছবিতে বৃষ্টি এনে দিল ।
৬ । ব্লাডি প্রেমিক আমার জোছনার ডাকে বাইসন হয় ।
৭। সিগারেট জেটির রেলিং ধরে হেঁটে যায় ।
৮। সবুজ টিয়ার ঝাঁক প্লাস্টিক ছাদে রং ঝরায় ।
৯। ছটফট করে সমুদ্র ঝাউবন ফেলে জোরে বয়ে গেল ।

সমগ্র কাব্যটিতে এই ছয়লাপ ছড়িয়ে আছে। তবু মনে হয়েছে চেতনা নিরন্তর আদিমতাকেই স্পর্শ করেছে। আলোর শিং থেকে সমুদ্রের ছটফট মুখ্যত ক্রিয়ার প্রাচুর্য বলে মনে হয়েছে। কবি একই সঙ্গে অ্যান্টি পোয়েট্রির বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন যা ‘effective tones that contrast with one another’ অথবা একইসঙ্গে ‘laughter and tears’। কাব্যে যেমন পাই ‘‘ভায়োলিনের নবচেতনায় বিদ্যুৎ’’ তেমনি পাই ‘‘রাতজাগা পড়ার দিনে টেবিলচামচের তাঁবেদারিতে রয়ে গেলাম তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে ‘the poet becomes serious and then he begins to cry’ . কবির ভাব ও স্বাভাবিক কল্পনার মধ্যে একবিপরীত তাড়িত প্রেক্ষণ কাজ করে। নিয়ম বহির্ভূত এই স্বয়ংক্রিয় বিস্তারে কাব্যকলা বিতত হয় । কবি যে ‘attempts to breaking away from the normal conventions of traditional poetry’ এ কথা বলাই যায় চিলির কবি নিকনার পাররার ধারণা অনুযায়ী।

‘নোনামিঠে জলচিহ্ন’ কাব্যটি সব স্বাভাবিকতার ঊর্ধ্বে একব্যতিক্রমী কাব্য। প্রচ্ছদেও তানিয়া গুহমজুমদার নতুনত্ব এনেছেন । বাংলা সাহিত্যে এই ধারার কবিতা আন্দোলন কতদিন চলবে, পাঠক সাদরে গ্রহণ করবে কিনা কিছুই বলাই যায় না। তবু কবি দেবযানী বসুকে স্বাগত জানালাম।

নোনামিঠে জলচিহ্ন, দেবযানী বসু, কবিতা ক্যাম্পাস প্রকাশনী, প্রচ্ছদ : তানিয়া গুহমজুমদার, দাম - ৭০ টাকা

সাঁঝবাতি

পথ বেঁধে দিলো বন্ধনহীন গ্রন্থি

আমার কত নম্বর তিলে
তোমার পিলে চমকে গ্যাছে - - - জানতে চাই না/
. . .
তিলে, পিলে, খালে
এক পা ফাঁক করে হিসি করছে শিশুটা
ওকে কুকুর হতে শিখিও না
শিখিও না হি আর সি
তরঙ্গ যৌনতা ভালবাসা
এক- কেন্দ্রিক বৃত্তের জ্যা চেনার মতো
চুমু খাও - - - একটাই চুমু খাও
চুমু খেয়ে
খেয়ে নাও গোটা একটা আত্মা/ /

উত্তরণ চান উত্তাল চান না উড়ান চান সেটা আপনার ব্যাপার. .. তবে কোথাও অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যেতে গিয়ে, পড়ে যেতে গিয়ে ঘুমের পাশে কয়েকটা Slipping Pill রাখতে হয় ... পিলের নাম পুরুষের বাড়ি মেসোপটেমিয়া। যেসব ডাক্তার প্রেস্ক্রাইব করছেন, শুধু রাগ আর প্রতিবাদ করে কিচ্ছু হয় না তারা কি ভালবেসছেন? সেসব এখনো আত্মিক? সাত্ত্বিক এবং ব্যথার?

কতখানি পুড়লে তুমি চিৎকার করে বলবে

ভালবাসা তোমায় গুটিপোকা অবস্থায় মেরে ফেলেছে! / /

সব আঘাত তো সুরোভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম না। তাহলে রক না রোল আসতো না। আসতো না গথ কালচার বা আণ্ডারগ্রাউন্ড আর্ট। সমস্ত ছবিগুলো আসলে অন্ধকার প্রিয়। তবেই তারা জলে ভিজে ফটোগ্রাফ হয়ে উঠতে পারে।

নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদ ফাঁকি দিচ্ছে তোমায়
আসলে অনেক দিনের পর বুঝে গেছো
চাঁদের নিজের বলে কিচ্ছু নেই (*মিথ্যাচার) / /

আমাদের হেডফোন জেনারেশন এইভাবেই চাঁদ দেখে অন্ধকারে। এই ভাবেই আলো। আলো টুকুই জুনিপোকা। এবং সেই হাউলিয় ডাকে কোথাও এক্কাত্ম বোধ করে ফেলি আমি- 'I saw the best minds of my generation destroyed by /madness, starving hysterical naked, /dragging themselves through the negro streets at dawn /looking for an angry fix... '

শরীর শুধু একটা ছদ্মগর্ত
যে অনেকদিন ধরে
পৃথিবীর মতো একটা পিন্ডকে
অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার ভয় দেখাচ্ছে/ /

শরীরের সংজ্ঞা পিচ্ছিল। পাপ- পুণ্য করার আগে দুহাতে মাখব জীবাণুনাশক তারপর লালন সহোযোগে অন্ধকার গাইবো আমি একদিনও দেখিলাম না তারে/ আমার বাড়ির কাছে আরশিনগর/ তাতে এক পড়শি বসত করে...! কাকে হারিয়েছেন? কাকে খুঁজছেন? শোক... সন্তান... প্রেম... মৃত্যু... জীবন না নিজেকে? টাওয়ালের ভিতরে তুমি গাঢ় শিশু - - - বাইরে আততায়ী এইভাবে সামলে পেরচ্ছেন রাস্তা! কি ঘোর টেররিস্টিয় যুগ। আমাদের মিসট্রেস থেকে হোর বানিয়ে দ্যায়। অন্তে হোল।

যে দান ঝুলে গেছে দীনতার কাছে
সেখানে যুদ্ধের আগে বুক দেখো, স্তন নয়- - - / /

এই যে আপনি, একটু নিচু হয়ে বসুন। যে নিচু হয়ে বসলে মাটির কাছাকাছি আসা যায়, প্রেমিকার কাছাছাছি, মায়ের কোলের মত কবিতায়-

মাটির মধ্যে মা
মা থেকে শুরু জন্ম
জন্মের নারী উপুড় হয়ে বসে
পাতায় কুড়ায় প্রেম- - - / /

এই মেয়ে নরম জলের স্নান। প্রেম কি অকুন্ঠে দেখিয়ে দিচ্ছে, দেখে নিচ্ছে-

তোমাকে চাইনি আমি
অথচ চেয়েছি বহুদূর থেকে/ /

কুছ দাগ আচ্ছা হ্যায়। তবেই লেখা যায় সমর্পণ

কতক্ষণ তাকিয়ে থাকলে
সব বিনিময় হয়ে যায়/ /

অথবা

এত বেশী যুক্তি এনো না শরীরে
যাতে প্রেমও নিঃস্রাবী হয়ে ওঠে/ /

পিলের নাম পুরুষের বাড়ি মেসোপটেমিয়া। এরপরও আপনি বলবেন না, ঘুমগুলো আদ্যপান্ত প্রেমের কবিতা!
বোধের কবিতা - আদিতে আত্মা এসে অহং কামড়ে খেয়েছে. . .

বোধ থেকে বোধির কবিতা- তৃপ্তির গভীরে মৃত্যু থাকে
আলোর মতো. . .
আলেয়ার মতো ঘোরের গাঢ় মৃত্যু (ঘোরের মধ্যে থেকে) / /

এবং যন্ত্রণা আর কষ্টের কবিতা। প্রেম মানেই নারী পুরুষ না, শান্তি না, তৃপ্তি না... কবির অশান্তিযাপনই এখানে শব্দবোধ... নিজেকে হারিয়ে আবার খুঁজে ফেরা। মোমবাতি মিছিলে হাঁটবো না... হাতে কলম নিয়ে হাঁটবো... কাটারি নিয়ে হাঁটবো... যবোই যদি পুড়িয়ে ছারখার করে যাবো... ধূপধুনো দেখিয়ে না। আমরা শরীরকে মন্দির ভাবার আগে মদ ভেবে নিচ্ছি। আর তানিয়া লিখছেন-

প্রেম যদি অর্জন
প্রেম যদি জৈবিক
এসো না, প্রেম যদি সমর্পণ হয়
এসো- - -
যদি প্রেম, প্রেম হয় / /

অথবা আমাদের প্রেমে না পড়ার কবিতা-

যে দেশে বেড়াতে গেলে
তুমি সঙ্গে নাও প্রেমিকার চুল
সে দেশে হারিয়ে গেলে বুঝো
প্রেমিকা নয়, প্রেমের ঈশ্বর
তোমার থেকে পালিয়েছে বহুদূর- - - / /

সবটুকু পড়ার পর খানিকক্ষণ চুপ করে যেতে হবে। “I am seeking, I am striving, I am in it with all my heart.” (Vincent van Gogh) আমরা প্রবল ভাবে বাঁচার জন্যে লড়াই করছি। চুপচাপ লড়াই করছি, আমাদের বহুরাঙ্গা দুর্দিনে আমরা মিথ্যের সাথে লড়াই করছি-

নায়ক ফেরারী হলে খলনায়ক দৌড়ে আসে
কারণ এটাই তো খরগোশ আর কচ্ছপের গল্প/ /

কোথাও আমাদের কথা তানিয়ার কবিতা হয়ে গ্যাছে-

এবার বাঁচো, বাঁচার আগে ধরে নাও
ধরিত্রী তোমার গলা দিয়ে আগুন দিচ্ছে শিশুর নাভিতে

আগুনখাকি মরণব্যাপী জীবনছবি/ /
* * *
তবু মিথ্যে বোলো না
মিথ্যে শরীরে সঙ্গম বন্ধ্যা হয়/ /

* * *

মিথ মিথ মিথ মিথ্যের শহর কলিকাতার কবিতা। এখানে গাড়ি দাঁড়ালেই

হাসনুহানার গায়ে বেলীর গন্ধ
এই প্রগলভতায় মাল্টিপ্লেক্সের গা থেকে
- - - ঝরে পড়ছে রুমফ্রেশনার
আশ্চর্য প্রদীপ চাই
রেডলাইট এরিয়ায় গিয়ে প্রদীপের মুখ খুলে দেব/ /

এমন একটা থমথমে সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা সব্বাই হেঁটে যাচ্ছি।

নিশ্বাসের ঘনীভবন অবধি
চিলেকোঠায় পাখির ওড়া অবধি
চলন্ত সিঁড়ির কোমড় অবধি
বিষণ্ন রাস্তার জাতীয় পথিক হয়ে আছি
কোনো ধারে নেই বিশ্রামাগার

পড়তে পড়তে ভয় লাগে। যেভাবে আমরা বইমেলা থেকে ফেরার পথে রাস্তা হারিয়ে হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম... যেভাবে বুঝতে পারছিলাম না চেঁচাবো কিনা... কোনো গাড়ি সাহায্যের জন্যে থামছেনা কেন... আমরাই বা থামাতে পারছি না কেন? কার উদ্দেশ্যে হাত নাড়িয়ে যাচ্ছি? কোন ভয়ে আঁকড়ে ধরেছি পেপার স্প্রে? কোন ভয়ে গলা থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে না অথচ, অথচ কিছু বলতে চাইছি? রাস্তা হারিয়ে যাওয়ার পর আরো বেশি অন্ধকার লাগে কেন? কেন হাতড়ে বেড়াচ্ছি পরস্পরের হাত আর নিজেরও... এই সব ভয় ঘুম টেনসান লড়াইগুলোর নাম পুরুষের বাড়ি মেসোপটেমিয়া। আমরা সবাই এই পথ দিয়ে যাচ্ছি বা গেছি বা যাবো। পথ তো একটা দ্বিধা মাত্র অন্তত কাফকা তাইই ভাবতেন। সেই রাস্তার মাঝে কোনো বিশ্রামাগার আসবে না কিন্তু পিছলে বুদবুদের মত উড়ে যেতেই হবে... রাস্তাই একমাত্র রাস্তা।

আমাকে নিরন্তর ফেনা ভেবো
শুধু সাবানের মৃত্যু মনে রেখে / /

একে উত্তরণ বলবেন না- উত্তাল- না উড়ান আপনার ব্যাপার... কিন্তু আমাদের পারতেই হবে।।

পুনশ্চ - মারুন/বীতংস/ আর্তব/অধ্যাস এই ধরনের কিছু শব্দের ব্যবহার আমার অবাক করেছে। কভারটি কবিতার সাথে লাগামসই লাগে না কখনো কখনো। এবং মনে হয়েছে প্রোডাকশান আরো ভাল হতে পারতো তবুও যতো অল্প সময়ে যে গল্পকথা তৈরি হল তার জন্যে রোহণ কুদ্দুস ও কাজল সেনকে ধন্যবাদ।

পুরুষের বাড়ি মেসোপটেমিয়া, তানিয়া চক্রবর্তী, সৃষ্টিসুখ প্রকাশন, প্রচ্ছদ : রোহণ কুদ্দুস, দাম - ৭৫ টাকা

কবিতা পাঠ : জেফারসন হ্যানসেন

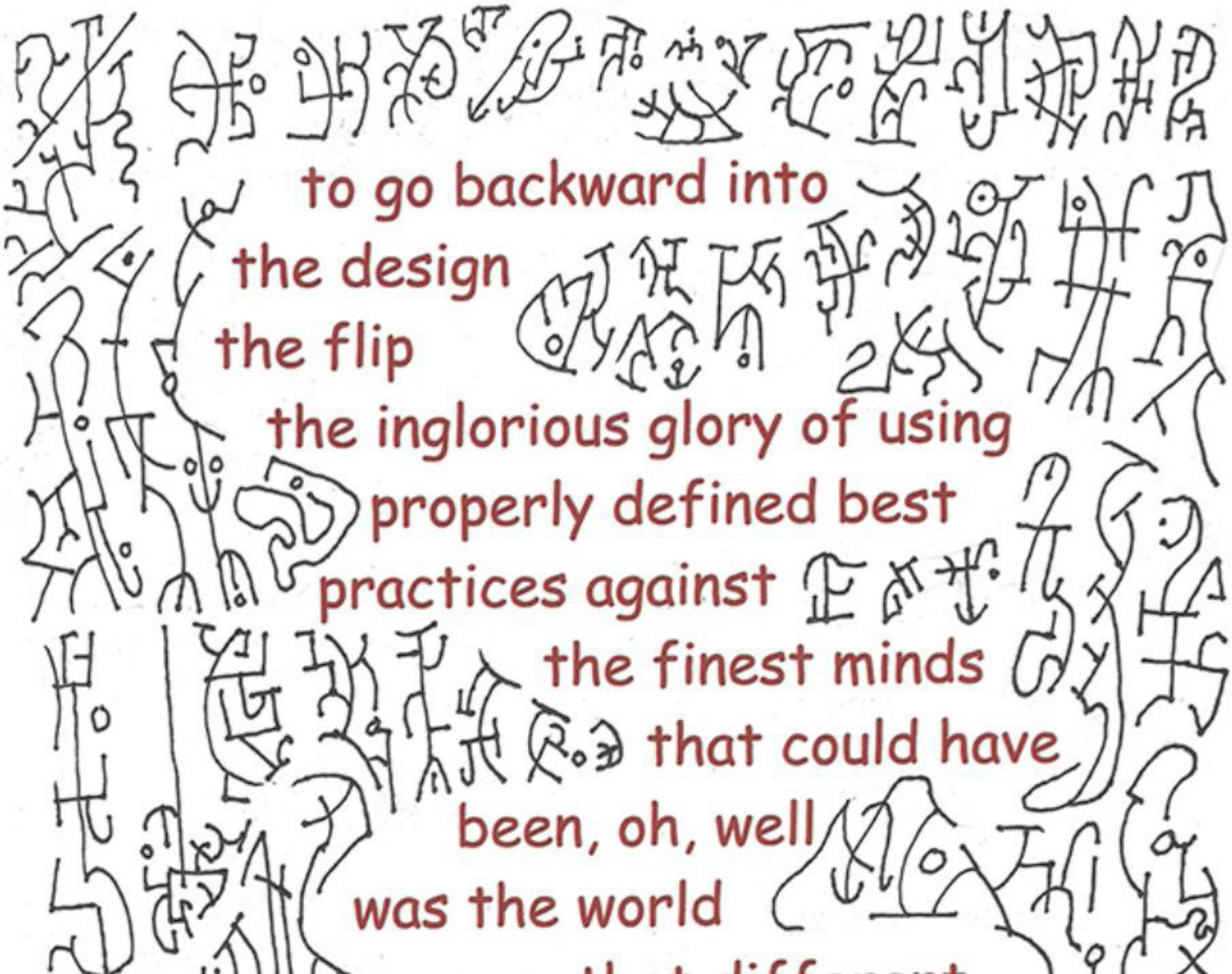
to go backward into
the design
the flip
the inglorious glory of using
properly defined best
practices against
the finest minds
that could have
been, oh, well
was the world

গত সংখ্যার পাঠ- প্রতিক্রিয়া

Shyamal Som : It's really amazing excellent, congratulations.
I am grateful to all, as you were with me on my sweet and sorrow moments in the past years together, specially to my dear sweet little Mothers who are always compassionate with love, I am en reaching on your excellent writings.
I convey my heartist deep love and best wishes for the Happy New year 2015.
I pray to Lord God for blessings for you and your families

Japamala GhoshRoy : আমার প্রিয় পত্রিকার অন্যতম। পড়ে মতামত জানাবো। দীপংকর দিল্লীর এই প্রখর শীতকে উপেক্ষা করে তোমার নিরলস পরিশ্রম, ও একাগ্রতা কে স্বাগত জানাই। পত্রিকার উত্তরোত্তর ঋদ্ধি কামনা করি

Ranjan Moitra : Happy new year. Natun bachharer aagam shubhechha nis. Valo thakis. Shunyakaal-er joy hok
Indranil Chakrabarty : onek shubechha

Pijush Biswas : Thus the efforts are becoming another milestone , with Dipankar, SHUNYAKAAL becomes benchmark for content excellency in Bengali literature's sky. With advent of these web magazine, the literature itself will become a passion for reader across all social media in very near future, thanks again for making part of it.

Moulinath Biswas : 9th ইস্যুতে রবীন্দ্র গুহ- র লেখাটা একটা জরুরি কাজ হয়ে থাকলো। সব লেখা সবসময় পড়া হয়ে ওঠে না। পত্রিকা- টার মান বেশ ভালো। 2015 স্বাস্থে, শান্তিতে কাটুক।

Utpal Barman : HAPPY NEW YEAR

Astanirjan Dutta : Darun hoyechhe..darao darao ...Hasnat Soyeb fatie diechhe ekebare....Indra da..r Anirbanda chirokal i amar priyo.... aro pori, pore bolchhi...Anuradhao duto darun lekha likhhechhe.. or kabita amar speed ke ektu dar korie rakhhe.... kabita gulo ei kata pora holo....r ektu abes nie abar Anirbanda theke Robayet pore felbo...fatafati...

Banerjee Manash : আপনাদের পত্রিকাটি ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ আপনাকে এবং আরো যদি পিডিএফ আকারে কবিতার বই থাকে তবে দেবেন। ধন্যবাদ। আর হ্যাঁ , শুভ সকাল।

Indranil Chakrabarty : Taniya Chakraborty r boi Kichhu Ektar Jonyo r anek kabitai besh besh bhalo laglo.

Farid Uddin Mahammad : thanks

Ajit Roy : ASADHARAN ! RABINDRA GUHA BESH

Barin Ghosal : ওয়েল ডান দীপু।

Mou Das Gupta : FB তে আজকাল খুব অনিয়মিত হয়ে পড়েছি..তাই শূন্যকাল ওয়েবজিন পড়তে দেরী হল কিন্তু miss কিরিনি...করলে তো আমারি ক্ষতি ..স্বল্প অবসরে কি সুন্দর ভাবে গোছানো উপস্থাপনা ...ভিন্ন কবি..ভিন্ন রুচি..ভিন্ন কলম...ভিন্ন ভাবনা...মিলেমিশে পাঠক পাঠিকাদের জন্য এক মহাভোজ...চোখের পথ বেয়ে মনকে তৃপ্তি ঈ শুধু দেয় না..প্রতীক্ষাও বাড়ায়...সাগ্রহে অপেক্ষায় রইলাম পরবর্তী সংখ্যার জন্য. .

Japamala GhoshRoy : ঋষি সৌরকের কাব্যডায়রির অসাধারণ কিছু উচ্চারণ মুগ্ধ করল। হ্যাঁ কাব্যডায়েরি ই বলছি, যেহেতু সম্পাদক সূচিপত্রে সেরকমই উল্লেখ করেছেন এবং কবি নিজে কতকগুলো তারিখ উল্লেখ করেছেন। আমি এই টেক্সট এ সেই অর্থে কোন ডায়রিত্ব খুঁজে পাই নি। বরং ডায়েরিয়ানা কে ছাপিয়ে ওঠা অসম্ভব ভালো কবিতাগুচ্ছ। তিনি ধ্রুবতারা না চেয়েও কখন কিভাবে যেন ধ্রুব কেই প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন এটাই কবির নির্মাণপ্রজ্ঞা। "ধ্রুবতারা তো চাই না, চাইনা প্রেমের কাফনে শূন্যের লোগো/ প্রতিটি ভাঙনের ইতিহাস এক অদৃশ্য টার্বুলেন্স এর কথা বলে"
"আমার শ্বাসমূল এখন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে পরাবাস্তব অঙ্গুলিহেলনে/তিল তিল ফিকে হওয়ার চেয়ে হাউই রঙে ফেটে যেতে চাই"
অথবা, "একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলে ধীমন্থর কোন স্বপ্নের লেজ দিয়ে বেরিয়ে আসছে মামনির মা আর বুক ঘষটে খুঁজে নিচ্ছে খসে পড়া

বাহারি ছহাল" এই হাউই রং, ধীমন্থর বুক ঘষটানো মামনির মা- - - এইসব জাদুবাস্তবতা চমৎকার

Ric Sourock : Pronam o bhalobasa neben Japamalal di

Ayon Ghosh : I just came across your Shunyakaal website and I am delighted at the goldmine that it is. I am highly interested in modern Bengali poetry, especially the Hungry movement and I write a few poems in my leisure as well. In this regard may I ask you if it is possible to publish my poetry in your Shunyakaal magazine.

Pranab K Chakraborty : Valo legechhe. Durdanto kaaj hochhe. Patrikay ad. korechhi. Dekhechho !

Shunyakaal Webzine : Dekhechhi Pranabda. Thanks

Pranab K Chakraborty : Dhannyobad.

Sridarshini Chakraborty : @ Umapada Kar > Bahh....khub joruri alochona.... sotyi-i " এরা সবাই নিজস্ব স্বরে ভাস্বর". khub bhalo laglo erokom ekti alochona dekhe. Umapada da. Dhonyobaad Shunyakaal Webzine!

Pranab Basu Ray : @ Umapada Kar > খুব সদর্থক আলোচনা, অমিতাভর বইটা আমি পড়েছি। চমৎকার সে বই

Astanirjan Dutta : @Umapada Kar > baho umada eder besirvag r boigulo amar priyo..ebang darun ekta alochona korechhyo....

Animikh Patra : @ Umapada Kar > উমাদা'র জন্য কোনো ধন্যবাদই যথেষ্ট নয়।

Debasis Mukhopadhyay : @ Umapada Kar > ভালো লাগল আলোচনা

Sonali Mitra : @ Umapada Kar > লেখাটি থেকে অনেক অনেক জানলাম,ভাবনার পরিসর ব্যাপ্ত হল. . . . . .

Ranjan Moitra : Aha. Asadharan ei chhabi. Jeeo Deepankar.

Debayudh Chatterjee : @ Rishi Sourock > পুরোটাই সময় নিয়ে পড়লাম তবে কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমার অক্ষমতা

Ric Sourock : By Default

Shantanu Kabeer : তানিয়া চক্রবর্তীর দুটি কবিতা বেশি ভাল লেগেছে।

Sayantan Adhikary : বাহ, বেশ বেশ, অনেক শুভেচ্ছা Taniya Chakraborty

Uday Narayan Jana : @ Astanirjan Dutta > Ki sob asadharon anuvaber shahi biriyani.

Arghya Roy : @ Astanirjan Dutta > বদরুদ্দিন টিপুর ছোট ছেলে সম্পূর্ণ সর্ষের তেল আনতে চলে গেছে
তবে কি হাত তুলে দিগন্তে একটু মাখাবে
গুল্মগুলোকে গরমের বালমুসিবতগুলোকে

সাবান ফুটো করে চলে যাবে বেশুমার চর্বির ভেতর
হে জাহাঙ্গির

Nibedita Majumder : @Astanirjan Dutta > aro jeno besi sohoj ar suswadu hoyechhe!!! Sadhu!

Souva Chattopadhyay : @Astanirjan Dutta > বাহ! অপূর্ব হয়েছে। চমতকার! !

Joyshila Guhabagchi : @Astanirjan Dutta > Khub valo hoyeche

Soubhik Dutta : @Astanirjan Dutta > eto sundor likhchis অস্ত, toke na valobese upay nei, likhe ja, mughdho kore ja.....

Debasis Mukhopadhyay : @Astanirjan Dutta > darun lekha. aro lekho r amra pori